সূচীপত্র

مجلّة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ১১-১২

www.weeklyarafat.com

কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক
র‍্যাংকিংভুক্ত কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সনামধন্য
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

মাদরাসাতুল হাসানাহ

ভর্তি চলছে

আপনার
সোনামণির
সুশিক্ষার
নিরাপদ
ঠিকানা

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

আমাদের
নিয়মিত
অ্যাকাডেমিক
প্রোগ্রাম

বালক ও বালিকা
পৃথক শাখা

তাহফীজুল কুরআন
মক্তব । নাজেরা । হিফজ । রিভিশন

ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
হিফজসহ প্লে-অষ্টম শ্রেণি
(ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)

উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম
আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স
ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স
কুরআন শিক্ষা
দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম

পরিচালনায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
Adjunct Faculty
Manarat International University.
Former Faculty
King Khalid University &
University of Bisha, KSA.

বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।
01894762337, 01973936173

সুখবর সুখবর

KULLIYATUL QURANIL KAREEM WADDIRASATIL ISLAMIYAH

كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

বিশুদ্ধ ধারার একটি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

ভিশন : দক্ষ মুখলিস আলেম গঠন।

“মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে”

ভর্তি চলছে

আবাসিক/অনাবাসিক

সম্পূর্ণ অ্যারাবিক মিডিয়ামে সানাবিয়্যাহ-তে (আলিম)

আলিম সাধারণ বিভাগ

শুধু বালক

সানাবিয়্যাহ (উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য :

- মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ডক্টরেট/ মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত স্কলার দ্বারা পাঠদান।
- আলিমের সিলেবাসের সাথে সমন্বয় করে সানাবিয়্যার সিলেবাস তৈরি।
- আরবি ভাষায় পড়া, লেখা ও বলার পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
- মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা।
- কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

প্রতিষ্ঠাতা:

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

পি এইচ ডি, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

যোগাযোগ

৯ ও ১৭, রোড: ৬/এ, সেক্টর: ৫, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

০১৮৩৪ ১৭৭৭৬৫ / ০৯৬১০ ৯৯১৯৯

kulliyatulquran.com kulliyatulquran

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচীপত্র

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ১১-১২
* বার : সোমবার

◈ ১১ ডিসেম্বর-২০২৩ ঈসায়ী
◈ ২৬ অগ্রহায়ণ-১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ২৬ জমাদিউল আউয়াল-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৩
আল কুরআনুল হাকীম :
❖ ধর্মীয় বিশ্বাস ও হৃদয় মনে তার প্রভাব
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৪
হাদীসে রাসূল ﷺ :
❖ পিতা-মাতার প্রতি সদাচার
আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৮
প্রবন্ধ :
❖ সমাজে জাল ও য'ঈফ হাদীসের কুপ্রভাব
মাযহারুল ইসলাম- ১২
❖ দৃষ্টি হেফাজতে মেলে আল্লাহর সন্তুষ্টি
মেহেদী হাসান সাকিফ- ১৭
আলোকিত জীবন :
❖ স্মৃতির আরশিতে আমার স্যার, এ. বি. এম হোসেন
আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১৮
ক্বাসাসুল হাদীস :
❖ আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কিছু গুণাবলী
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৩
বিশেষ মাসায়িল ২৪
সমাজচিন্তা :
❖ ওয়াজের ময়দানের বক্তা ও প্রকৃত আলেম
মূল : ঈসা আল-কাদূমী
অনুবাদ : আসিফ রেজা- ২৭
ইতিহাস-ঐতিহ্য :
❖ সাহাবিদের 'আমলে নির্মিত লালমনিরহাটের হারানো মসজিদ
মো. কায়ছার আলী- ৩০
কিশোর ভুবন :
❖ আমি একটা হাতি!
মূল : আব্দুত তাওয়াব ইউসুফ
অনুবাদ : আহমাদ রফিক- ৩২
কবিতা ৩৪
জমঈয়ত সংবাদ ৩৫
শুব্বান সংবাদ ৩৭
ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৩৮
প্রচ্ছদ রচনা ৪২
আলোকিত ভুবন ৪৩

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সম্পাদকীয়

ইংরেজি নববর্ষ ও আমাদের ভাবনা

সংস্কৃতি একটি জাতির দর্পণ। সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতির আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও সভ্যতার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। দেশ, জাতীয়তা ও ধর্মভেদে সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও এর মূল উৎস যে ধর্ম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীগণ নিজ নিজ ধর্মের বিধান মতেই মৌলিক সংস্কৃতি চর্চা করে থাকে। পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত সংস্কৃতি মানব মননের সুকোমল অভিব্যক্তি, যা কখনো কখনো ভৌগলিক সীমানা ছাড়িয়ে ইনসাফভিত্তিক ঐক্য ও বিবেকের জাগরণ ঘটায়। কিন্তু যে সব উৎসব ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাসের পরিপন্থী, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিংবা সময় ও অর্থের অপচয় বা বাহুল্যতা থাকে, তা একজন মুসলিমের জন্য কখনোই শোভনীয় নয়।

আমরা জানি যে, মহামানব মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আবির্ভাবের পূর্বের যুগ ছিল আইয়্যামে জাহিলিয়াহ্ বা মূর্খতার যুগ। সেই জাহিলি যুগের আরবরাও সমরবিদ্যা, অতিথি সেবা, আন্তঃদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে খ্যাতি লাভ করেছিল। শিল্প-সাহিত্যের চর্চায়ও তারা ছিল অগ্রগামী। সে সময়ের ইতিহাস বিখ্যাত 'উকাজের মেলা'র কথা আমাদের জানা আছে। কবিতা উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতা স্থান পেয়েছিল পবিত্র কাবার দেওয়ালে, যাকে বলা হয় 'সাবউল মুয়াল্লাকাত'। ছিল নববর্ষ পালন ও ঘোড়দৌড় উপলক্ষ্যে প্রচলিত 'নওরোজ' ও 'মেহেরগান' নামের দু'টি উৎসব। কিন্তু ইসলামের সর্বশেষ বার্তাবাহক মুহাম্মদ (ﷺ) আরবের মরুর বুকে আবির্ভূত হয়ে জাহিলি আরবের সেসব সংস্কৃতি ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করলেন। কেননা, তাতে ছিল না মানবতা ও নৈতিকতার ছোঁয়া; বরং ইবলিসকে খুশি করার উপকরণ-অনুষ্টুপ নাচ-গান, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার বেসাতি।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাধ্যমে জাহেল আরব জাতিকে সতর্ক করে বলেন, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, কেননা শয়তান তো নির্লজ্জ ও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। সাথে সাথে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-ও সতর্ক করলেন, যে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের অনুকরণ বা সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে তাদেরই দলভুক্ত হবে।

ক'দিন পরে আমাদের দেশের কিছু তরুণ-যুবক এবং একশ্রেণির মাঝ বয়সী অর্বাচীন থার্টি ফাস্ট নাইট বা ইংরেজি বর্ষবরণ উৎসবে মেতে উঠবে। অথচ এদেশের সচেতন অর্ধশিক্ষিত এমন কি অশিক্ষিতরাও জানেন যে, থার্টি ফাস্ট নাইটের সাথে ইসলামী সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই, আর না আছে আমাদের দেশীয় কিংবা বাঙালি সংস্কৃতির কোনো সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য। বাঙালি-বাংলাদেশি মুসলিম জাতিকে সতর্ক করতে এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু সতর্কবাণী সম্বলিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে; নতুন করে বলার কিছুই নেই। যারা সচেতন তারা উপদেশ গ্রহণ করেছে, আর যারা অন্ধ তাদের পথ দেখাবে কে?

আমরা যারা মুসলিম তারা থার্টি ফাস্ট নাইটের অপসংস্কৃতি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি। তবে যা কিছু ভালো তার সাথে আমরা আছি। ভালোকে ভালো বলা এবং মন্দকে মন্দ জানা ও তাথেকে সতর্ক থাকা আমাদের স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। ডিসেম্বর মাস শেষ হওয়া মানে একটি বছর আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া এবং দরজায় নতুন বছরের কড়াঘাত। কী করেছি এ বছর (?) যা দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের ভালো ফলাফল আশা করতে পারি। আর কীভাবেইবা স্বাগত জানাবো নতুন বৎসরকে? আছে কোন সুন্দর পরকল্পনা, যা দিয়ে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আলোর পথ দেখাতে পারবো? নিশ্চয়ই এর কোন সঠিক উত্তর হয়তো অনেকের কাছে নেই। সন্তানকে নামী-দামী মাদ্‌রাসাহ, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যলয়ে ভর্তি করানোর প্রতিযোগিতা বেশিরভাগ অভিভাবকের আছে; কিন্তু নৈতিক গুণ সম্পন্ন আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছবিচারে সে চেতনা গৌন হয়ে যায়। আমাদের সন্তানদের নতুন ক্লাস, নতুন বই হতে তোলে দেওয়ার স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু কী দিচ্ছি আর কী পড়াচ্ছি, তা নিয়ে আমারে বিবেক কতখানি জাগ্রত। পড়ালেতো হবেনা, সন্তানকে মানুষ করতে হবে। প্রকৃত মানবতার জ্ঞান দিতে হবে। পিতা-মাতা ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীলতার দীক্ষা দিতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে চেনা এবং আল্লাহ প্রদত্ত দীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেওয়া। দেশ ও জাতির প্রতি স্বভাবপ্রসূত ভালোবাসায় সিক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করা-এসবের কী কোন বালাই আছে? ঐদি স্বপন সঠিক হয়, লক্ষ্য স্থির থাকে এবং যথোপযোক্ত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়, তাহলে সন্তানদের নিয়ে আমাদের ভাবনা কাজে দেবে; নতুবা স্বপ্নঘোর বা দিবাস্বপ্নে পরিণত হবে।

অতএব আসুন, আমরা আত্মসমালোচনা করি। সৎকর্মে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। সর্বপ্রকার অন্যায় ও অশ্লীলতাকে বর্জন করি। আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের সুবুদ্ধির উদয় ঘটিয়ে নি এবং আমাদেরকে সুপথে পরিচালনা করুন! আমীন!! ❑

আল কুরআনুল হাকীম

ধর্মীয় বিশ্বাস ও হৃদয় মনে তার প্রভাব

–আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন★

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿صِبْغَةَ اللهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُوْنَ ○ قُلْ أَتُحَاجُّوْنَنَا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ ○ أَمْ تَقُوْلُوْنَ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ۗ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

সরল অর্থানুবাদ

"আমরা আল্লাহরই রংয়ে রঞ্জিত, আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতম রঞ্জিতকারী? এবং আমরা তাঁরই বান্দা। তুমি বলো : তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিরোধ করছ? অথচ তিনিই আমাদের রব্ব ও তোমাদের রব্ব এবং আমাদের জন্য আমাদের কার্যসমূহ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্যসমূহ এবং আমরা তাঁরই প্রতি বিশ্বস্ত। তোমরা কি বলছ– ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদীয় বংশধরগণ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান ছিল? তুমি বলো : তোমরাই সঠিক জ্ঞানী, না আল্লাহ এবং আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য যে ব্যক্তি গোপন করছে সে অপেক্ষা কে বেশি অত্যাচারী? আর তোমরা যা করছ তা হতে আল্লাহ অমনোযোগী নন। ওটা একটি জামা'আত ছিল যা বিগত হয়েছে; তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য এবং তারা যা করে গেছে তদ্বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।"[১]

দারসের বিষয়বস্তু

আল্লাহ তা'আলা আমাদের খালেক্ব ও মালেক। তিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন অনিবার্য। তাই তাঁর প্রতি নিখাঁদ বিশ্বাস ও একনিষ্ঠ কর্ম আমাদের প্রশান্তি ও মুক্তির একমাত্র অবলম্বন। মনের মণিকোঠায় স্বচ্ছ ও সরলতার প্রদীপ জ্বালাতে ঈমানের কোনো বিকল্প নেই। সঠিক ঈমান মানুষকে সভ্য হতে শেখায় এবং কর্মে নিষ্ঠাবোধ জাগ্রত করে। মহান আল্লাহর উলুহিয়্যাত ঐক্য ও সংহতির অনন্য মাধ্যম। তাঁর দাসত্বের অধীনে সব মানুষ সমান। কেবল শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরাই পাবে, যাঁরা তাক্বওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আলোচ্য দারসে সে সত্য কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

বিশেষ পরিভাষা

صِبْغَةَ আভিধানিক অর্থে বিশেষ এক রং কে বুঝায়। এখানে ঈমান অথবা মহান আল্লাহর দীন উদ্দেশ্য। কাপড়ের উপর রং-এর প্রভাব যেমন দৃশ্যমান হয়, ঠিক তেমনি ঈমানের প্রভাব 'আমলকারীর উপর পরিলক্ষিত হয়।

أَتُحَاجُّوْنَنَا فِي اللهِ এখানে অস্বীকৃতি তিরষ্কার অর্থে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ দাঁড়ায় 'তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তর্ক করছ, যা বড়োই নিকৃষ্ট ও কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

★ *সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস।*

[১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৩৮-১৪১।*

مُخْلِصُوْنَ দীন ও ন্যায়-ইনসাফ মেনে আমরা নিষ্ঠাবান।

قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ 'তোমরা কি বেশি জানো না আল্লাহ বেশি জানেন'(?) এখানে আল্লাহ-ই বেশি জানে এবং তিনি এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক্ব ও ইয়াকুবগণ (আলাইহিমুস সালাম) ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান ছিলেন না।

শানে নুযূল : দারসে উল্লেখিত প্রথম আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : খ্রিষ্টানদের কোনো সন্তান হলে ৭দিন এক বিশেষ রং-এর পানি দ্বারা সাজিয়ে রাখতো এবং খাতনার বদলে এটিকেই তারা পবিত্রকরণ মনে করতো। আর তারা দাবি করতো যে, সন্তানটি সম্পূর্ণরূপে খ্রিষ্টান হলো। তখনই আল্লাহ তা'আলা ওদের এ অবান্তর ও অযৌক্তিক দাবির খণ্ডন করে এ আয়াতে কারীমা নযিল করেন।[২]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহর বাণী : ﴿صِبْغَةَ اللهِ﴾ "আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি" –এ আয়াতে মহান আল্লাহর রং মহান আল্লাহর দীন উদ্দেশ্য। মুজাহিদ, আবুল 'আলিয়া, ইকরামা ও ক্বাতাদাহ্ প্রমুখ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সূত্র উদ্ধৃত করে অভিন্ন মত প্রকাশ করেন। আর ইবনু কাসীর ও সুদ্দী আর-রাবি'য় ইবনু আনাসের সূত্র উল্লেখ করে বলেন : এখানে মহান আল্লাহর রং দ্বারা 'ফিতরাতুল্লাহ' বা মহান আল্লাহর ফিতরাত উদ্দেশ্য।[৩] আর ফিতরাত বলতে মহান আল্লাহর তাওহীদ 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বুঝায়। অর্থাৎ- তোমরা একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর দীনকে আঁকড়ে ধরো –এটাই তোমাদের করণীয়।

মহন আল্লাহর বাণী : ﴿قُلْ أَتُحَاجُّوْنَنَا فِي اللهِ﴾ "বলুন! তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করছ" –এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (ﷺ)-কে বলেন : মুশরিকদের অবান্তর দাবির প্রতিউত্তরে আপনি বলুন! তোমরা কি আমাদের সাথে মহান আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর জন্য বিনীত হওয়া, তাঁর আদেশসমূহ পালন করা ও নিষেধ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে বিতর্ক করছ? অথচ তিনিই হলেন একক ও অদ্বিতীয় সত্তা, ইলাহ বা উপাস্য হিসেবে একান্তই হক্বদার এবং তোমাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী।[৪] আর আমরা তোমাদের থেকে এবং তোমরা যাদের 'ইবাদত করো তাদের থেকে মুক্ত। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾

"যদি তারা তোমাকে মিথ্যা জেনে অমান্য করে, তাহলে বলো, 'আমার কাজের জন্য আমি দায়ী। আর তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী। আমি যা করি তার দায়-দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যা করো তার দায়-দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।"[৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿فَإِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾

"অতঃপর যদি (আহলে কিতাব) তোমার সাথে তর্ক করে তবে বলে দাও! 'আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি আর আমার অনুসারীরাও আত্মসমর্পণ করেছে।"[৬]

মহান আল্লাহর বাণী : ﴿كَانُوْا هُوْدًا أَوْ نَصَارَىٰ﴾ "তারা ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টান ছিল" –এ দাবি তোমরা কেমন করে করলে(?) অর্থাৎ- ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকুব ও তাঁদের সন্তানগণতো তাওহীদের উপর

---

[২] *তাফসীর আল-কুরতুবী- ২/১৪৪, গৃহীত : ড. ওয়াহবাহ আয-যোহায়লী 'আত-তাফসীর আল-মুনীর' দারুল ফিক্র-দামেশ্ক, ১/৩৫৬-৩৫৭।*

[৩] *ইবনু আবি হাতেম- ১/১০৪, গৃহীত : আল-মিসবাহুল মুনীর 'দারুস সালাম' রিয়াদ/১১০।*

[৪] *মুহাম্মাদ নাসীব আর-রেফা'ঈ 'তাইসীরুল 'আলিইল ক্বাদীর' মাকতাবাতুল মা'আরিফ-রিয়াদ ১/১১৫।*

[৫] *সূরা ইউনুস : ৪১।*

[৬] *সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান : ২০।*

প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বলেন :

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"ইব্রাহীম ইয়াহূদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' অর্থাৎ- সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী, আর তিনি মুশরিক ছিলেন না।"[৭]

এ কথা স্পষ্ট হওয়ার পরও মিথ্যাবাদী আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা বলে বেড়ায় যে,

﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"আর তারা বলে, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ওটা তাদের আকাঙ্খা মাত্র। বলুন! ঐদিন যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের দলিল পেশ করো।"[৮]

বরং তারা এ কথাও বলে থাকে যে,

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"ওরা বলে, 'তোমরা ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টান হয়ে যাও, তাহলে হিদায়াত পাবে। বলুন! একনিষ্ঠ হয়ে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"[৯]

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বলার পর ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টবাদের দিকে আহ্বান করা অজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য বৈ কি? এজন্যতো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : বলুন! তোমরা বেশি জানো না আল্লাহ তা'আলা বেশি জানেন? মহান আল্লাহতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকুব ও তাঁদের সন্তানগণ ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টান ছিলেন না; বরং একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন।[১০]

মহান আল্লাহর বাণী : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ "ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হবে, যে আল্লাহর পক্ষ হতে আগত সাক্ষ্যকে গোপন করে" –এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম হাসান আল-বসরী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন: তাদের নিকট আগত মহান আল্লাহর কিতাব তারা পাঠ করতো, যাতে আছে ইসলামই একমাত্র দীন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। আর ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক্ব, ইয়কুব ও তাদের অনুগত সন্তানগণ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান ছিলেন না। একথার সাক্ষ্য তারা মহান আল্লাহর নামে প্রদান করেছে এবং নিজেদের মনে মনে তা স্বীকার করেছে। তারপরও তারা মহান আল্লাহর এ সাক্ষ্যকে গোপন করেছে।[১১] তাদের এ মিথ্যা দাবি ও সত্য গোপন করার জন্য কঠিন ধমক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে গাফিল নন।" তোমাদের জ্ঞানের পরিধি তাঁর কাছে আয়ত্ব এবং তিনি তোমাদের মিথ্যাচারিতার যথাযথ শাস্তি প্রদান করবেন।

মহান আল্লাহর বাণী : ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ "এসব লোক যারা ছিল তারা গত হয়ে গেয়েছে" –এখানে خَلَتْ অর্থ গত হয়ে গেছে। তাদের আমলের প্রতিফল তারা পাবে এবং তোমাদের কৃতকর্মের ফল তোমরা ভোগ করবে। নিখাঁদ তাওহীদের অনুসরণ না করে তাঁদের প্রতি নিজেদেরকে সম্বোদিত করে কোনো লাভ নেই। মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন এবং তাঁর রাসূলগণের পথ অনুসরণের মাঝেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কাজেই অযথা হুজ্জত তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। মনে রেখো, যে ব্যক্তি একজন নবীকে অস্বীকার করবে, সে সব নবীকে অস্বীকারকারী বলে বিবেচিত হবে। বিশেষতঃ নবী সম্রাট, সর্বশেষ ও

[৭] *সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান : ৬৭।*
[৮] *সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ১১১।*
[৯] *সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ১৩৫।*
[১০] *মুহাম্মাদ নাসীব আর-রেফা'ঈ 'তাইসীরুল 'আলিইল ক্বাদীর' মাকতাবাতুল মা'আরিফ-রিয়াদ ১/১১৫।*
[১১] *আল-মিসবাহুল মুনীর 'দারুস সালাম' রিয়াদ/১১১।*

চূড়ান্ত নবী, যাকে আল্লাহ তা'আলা জগতবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন, তাঁকে অস্বীকার করলে মুক্তির কোনো পথ খোলা থাকবে না।[১২]

দারসের শিক্ষাসমূহ

০১. ঈমানের রং-ই প্রকৃত রং, যা মানব মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। আর তার আলামত বান্দার কর্মে ফুটে ওঠে।

০২. মহান আল্লাহর দ্বীন মানা এবং সে আলোকে জীবন পরিচালনা করা প্রকৃতির দাবি। এ দাবি পূরণ ছাড়া কোনো ব্যক্তি উভয় জগতের সফলতা লাভ করতে পারবে না।

০৩. ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন; তিনি ও তাঁর সন্তানগণ কখনো ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টান ছিলেন না। তাঁদেরকে ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টান বলে দাবি করা মহান আল্লাহর নামে মিথ্যাচারিতা ছাড়া আর কিছু না।

০৪. মহান আল্লাহর কিতাব পড়ে সত্য জানার পর তা গোপন করা বড়োই গর্হিত কাজ। এ অন্যায় কাজের শাস্তি অবশ্যই তাদেরকে পেতে হবে।

০৫. ঈমান না এনে এবং মহান আল্লাহর বিধানের যথাযথ অনুসরণ না করে পূর্ববর্তীদের দোহাই দিয়ে কক্ষনো মুক্তি পাওয়া যাবে না।

উপসংহার

ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান বড়ো ধূর্ত ও দুর্বুদ্ধির লোক। তার মধ্যে ধৃষ্টতার চরম শিখরে ইয়াহূদী সম্প্রদায়। সত্য জেনেও তা প্রত্যাখ্যান করা তাদের স্বভাবজাত ধর্ম। মহান আল্লাহর নবী ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব ও তাঁদের সন্তানগণ তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মুশরিকরা তাঁদেরকে ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান বলে মিথ্যা দাবি করে এবং মানুষকে ইব্রাহিমী মিল্লাতের অজুহাত দিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অনুসরণ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা চালায়। বক্ষমান দারসের মাধ্যমে ইয়াহূদী চক্রের মিথ্যা দাবির অসারতা প্রমাণ হলো। সত্য আসলে মিথ্যা অপসারিত হতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর খাঁটি বান্দা হওয়ার তাওফীক্ব দিন –আমীন। ❑

[১২] *মুহাম্মাদ নাসীব আর-রেফা'ঈ 'তাইসীরুল 'আলিইল ক্বাদীর' মাকতাবাতুল মা'আরিফ-রিয়াদ ১/১১৬।*

পিতা-মাতার প্রতি সদাচার

[১১ পৃষ্ঠার পর]

এজন্য সন্তানকে সর্বদা দু'আ করতে হবে,

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا﴾

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন।"[১৩]

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

"হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা করো যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে।"[১৪]

অতঃপর মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদ করা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি। জানা আবশ্যক যে, সাদাক্বায়ে জারিয়াহ দু'ভাবে হতে পারে।

(১) মৃত ব্যক্তি স্বীয় জীবদ্দশায় এটা করে যাবেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। কারণ মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে।[১৫]

(২) মৃত্যুর পরে তার জন্য তার উত্তরাধিকারীগণ বা অন্যেরা যেটা করেন।

সাইয়্যিদ রশীদ রিযা বলেন, দু'আ, সাদাক্বাহ্ (ও হজ্জ)-এর নেকী মৃত ব্যক্তি পাবেন, এ বিষয়ে আলেমগণ সকলে একমত। কেননা উক্ত বিষয়ে শরিয়তে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।[১৬]

উপসংহার

মা-বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার বা উত্তম আচরণ আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় 'আমল। মনে রাখতে হবে পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। পিতা-মাতার মৃত্যুর কারণে যেন মানুষের এ সৌভাগ্য নষ্ট না হয়। তাই কোনোভাবেই পিতা-মাতার সঙ্গে নাফরমানি করা যাবে না। অন্যায় আচরণ করা যাবে না। যে আচরণের কারণে মানুষ হতভাগা হিসেবে পরিগণিত হবে। ❑

[১৩] *সূরা বানী ইসরা-ঈল/ইস্‌রা : ২৪।*
[১৪] *সূরা ইব্‌রা-হীম : ৪১।*
[১৫] *সূরা আন্ নাজম : ৩৯।*
[১৬] *মির্'আত- ৫/৪৫৩।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

পিতা-মাতার প্রতি সদাচার

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

সরল অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন : তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস কররেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? রাসূল (ﷺ) বললেন, সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোনো একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) জান্নাতে যেতে পারল না।[১৭]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আব্দুশ্ শামস বা আবদে 'উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবন ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনাহ্। একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে– 'হে বিড়ালের পিতা'! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহার্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো। ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ﷺ) এ সাথে অংশগ্রহণ করেন। সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্‌ফা-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

পিতা-মাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষত বার্ধক্যে। তবে পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্যর দিক দিয়ে কোনো সময় ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِيۡمًا ○ وَاخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَةِ وَقُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيۡ صَغِيۡرًا﴾

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' শব্দটি বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার বাহু অবনমিত করো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন'।"[১৮]

[১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫১।*

[১৮] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ২৩-২৪।*

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক্ব বেশি :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ اَحَقُّ النَّاسَ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হক্বদার কে? রাসূল (ﷺ) বলেন তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, অতঃপর কে? রাসূল (ﷺ) বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, অতঃপর কে? রাসূল (ﷺ) বললেন তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, অতঃপর কে? এবারে নবী করীম (ﷺ) জওয়াব দিলেন যে, তোমার বাবা।[১৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ جِئْتُ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ اَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে ক্রন্দরত অবস্থায় রেখে হিজরতের উদ্দেশ্যে বাইয়াত করার জন্য নবী করীম (ﷺ)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন : ফিরে যাও তোমার পিতা-মাতার কাছে এবং তাদেরকে খুশি করে এসো যেমনভাবে তাদেরকে কাঁদিয়ে এসেছ।[২০]

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُجَاهِدُ قَالَ لَكَ اَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি জিহাদ করব? তিনি বললেন : তোমার পিতামাতা (বেঁচে) আছেন কি? লোকটি জবাব দিলো হ্যাঁ (বেঁচে) আছেন। রাসূল (ﷺ) বললেন : তবে তাদের দু’জনের মধ্যে জিহাদ করো। অর্থাৎ- তাদের দু’জনের খেদমত করো এটাই তোমার জন্য জিহাদ হবে।[২১]

মাতা-পিতার আনুগত্য কখন করা যাবে না :

﴿وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾

“আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক স্থাপন করার যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে গ্রহণ করো না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তোমরা কী করছিলে।”[২২]

অপর বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ اَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الْزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا.

মু‘আবিয়াহ্ ইবনু জাহিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। জাহিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি এবং এ ব্যাপারে আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। রাসূল (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাহলে তাকেই ধরে রাখো। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের কাছেই রয়েছে।[২৩]

পিতামাতার জন্য ব্যয় করা :

﴿قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ﴾

“তুমি বলে দাও, তোমরা ধন-সম্পত্তি হতে ভালো কিছু যা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও পথিকদের জন্যে খরচ করো।”[২৪]

---

[১৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৪৮।*
[২০] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৫২৭।*
[২১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬২৭।*
[২২] *সূরা আল ‘আনকাবূত : ৮।*
[২৩] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৫৫৭৭।*
[২৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২১৫।*

পিতামাতার জন্য দু'আ করা :

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! যে দিন হিসেব অনুষ্ঠিত হবে সে দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করো।"[২৫]

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ﴾

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন।"[২৬]

﴿قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا﴾

"হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"[২৭]

পিতামাতার প্রতি লানত করা কবীরা গুনাহ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (رضي الله عنهما) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো– কোনো লোক তার পিতামাতার উপর লানত বা অভিসম্পাত করা। জিজ্ঞেস করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে একজন লোক তার পিতামাতার উপর লানত করতে পারে? উত্তরে রাসূল (ﷺ) বললেন : একজন অপরজনের মাতা-পিতাকে গালি দেয়। তখন সেও ঐ লোকের পিতামাতাকে গালি দেয়।[২৮]

পিতামাতা হচ্ছে সন্তানের জান্নাত ও জাহান্নাম :

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ ﷺ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতামাতার কি হক্ব আছে? তিনি বললেন, তারা তোমার জান্নাত ও তারা তোমার জাহান্নাম।[২৯]

দুধ মা হালিমার সাথে রাসূল (ﷺ)-এর আচরণ :

اَبَا الطُّفَيْلِ اَخْبَرَهُ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ قال اَبُو الطُّفَيْلِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ اَحْمِلُ عَظْمَ الْجَزُوْرِ اِذْ اَقْبَلَتْ امْرَاَةٌ حَتّٰى دَنَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ فَقَالُوْا هٰذِهِ اُمَّهُ الَّتِيْ اَرْضَعَتْهُ.

আবূ তোফায়েল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে জিয়ারানা নামক স্থানে গোশ্ত বণ্টন করতে দেখলাম। এমন সময় জনৈকা মহিলা এসে তাঁর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজের চাদর বিছিয়ে দিলে তার উপর তিনি বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? লোকেরা বলল তিনি হলেন তাঁর মা যিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন হালিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।[৩০]

পিতামাতা কাফের হলেও তাদের সম্মান করতে হবে :

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ ﷺ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ اِذْ عَاهَدُوْا فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اُمِّيْ قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صَلِّيْ اُمَّكِ.

আসমা ইবনুতে আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে আসলেন। তিনি ছিলেন মুশরিকা। এ ঘটনা ঐ সময়ের যখন কুরাইশদের সাথ হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম– হে

---

[২৫] *সূরা ইব্রাহীম : ৪১।*
[২৬] *সূরা নূহ্ : ২৮।*
[২৭] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ২৪।*
[২৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬২৮।*
[২৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৬৬২।*
[৩০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫১৪৪।*

আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছেন অথচ তিনি ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট। সুতরাং আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন– হ্যাঁ, তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করো।[৩১]

মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয় :

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ.

আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মাতা-পিতার অবাধ্যতা ছাড়া অন্য যে সকল গুনাহ রয়েছে, এগুলোর মধ্যে থেকে অনেক গুনাহই আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যকে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে ছাড়েন।[৩২]

পিতা-মাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব : ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবাহর করাকে নিজের 'ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফর্‌য করেছেন। বলা হয়েছে–

﴿اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ﴾

অর্থাৎ- "আমার শোকর করো এবং পিতা-মাতারও।"

এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতের পর পিতামাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপর্ণ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। সহীহুল বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে–

"কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করল : মহান আল্লাহর কাছে সর্বাদিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন : (মোস্তাহাব) সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করল : এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন : পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।"[৩৩]

[৩১] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৬৯৮৫।*
[৩২] *বায়হাক্বী।*
[৩৩] *কুরতুবী।*

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার যে নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তার আলোকে বলা যায় যে পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, পিতার সাথে এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। আবূ উসায়দ বদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল, পিতামাতার ইন্তেকালের পরও তাদের কোনো হক্ব আমার জিম্মায় আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ তাদের জন্য দু'আ ও ইস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোনো অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতা-মাতার এসব হক্ব তাঁদের পরও তোমার জিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য : প্রথম করণীয় হলো– তাঁদের ঋণ পরিশোধ করা ও অসীয়ত পূর্ণ করা। অতঃপর মীরাস বণ্টন করা।[৩৪] অতঃপর পিতা-মাতার জন্য দু'আ করা, সাদাক্বাহ্ করা এবং 'ইল্‌ম বিতরণ করা। আরেকটি হলো তাদের পক্ষ হতে হজ্জ করা।[৩৫] তবে এজন্য উত্তরাধিকারীকে প্রথমে নিজের ফর্‌য হজ্জ আদায় করতে হবে।[৩৬] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে সৎকর্মশীল বান্দার মর্যাদার স্তর উঁচু করবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে এটা আমার জন্য হলো? তিনি বলবেন,

بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

'তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে।'[৩৭]

[৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৩৪] *সূরা আন্ নিসা : ১১।*
[৩৫] *ফিক্বহুস্ সুন্নাহ- ১/৩১০; তালখীস- ৭৬।*
[৩৬] *আবূ দাউদ- হা. ১৮১১; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৯০৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৫২৯, অধ্যায় : 'মানাসিক'।*
[৩৭] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১০৬১৮; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৬৬০; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৩৫৪, অনুচ্ছেদ : 'ইস্তিগফার ও তাওবাহ্'; সহীহাহ্- হা. ১৫৯৮।*

প্রবন্ধ

সমাজে জাল ও য'ঈফ হাদীসের কুপ্রভাব

–মাযহারুল ইসলাম*

সমাজে জাল এবং যঈফ হাদীসের প্রচলন সাহাবী পরবর্তী সময় থেকেই শুরু হয়। ফলে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রচার প্রসার ঘটে বিভিন্ন জায়গায়। তাই সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণ জাল এবং যঈফ হাদীসের ব্যাপারে খুবই সজাগ থাকতেন, সেইসাথে তাঁরা এর প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। দ্বীন ইসলামের ক্ষতি সাধন এবং উম্মাহর ঐক্য বিনষ্টের অন্যতম কারণ সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রচার-প্রসার। বক্ষমান প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইন্‌শা-আল্লাহ।

য'ঈফ হাদীসের পরিচয় : ইবনু সাবালাহ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন,

كل حديث لم يجمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو حديث ضعيف.

"যে হাদীসে সহীহ ও হাসানের বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়নি তাকেই য'ঈফ হাদীস বলে।"[৩৮]

তাইসিরু মুসত্বলাহিল হাদীস-এর লেখক ডক্টর মাহমুদ ত্বহান (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন,

هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه.

যে হাদীসের মধ্যে হাসানের শর্তসমূহের কোনো একটি শর্ত ছুটে যায় তথা হাসানের কোনো একটি শর্ত পাওয়া না যায়, তাকে যঈফ হাদীস বলে।[৩৯]

যঈফ হাদীস বর্ণনার হুকুম : যঈফ হাদীস বর্ণনার হুকুমের ক্ষেত্রে আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। তবে এক্ষেত্রে ইবনু হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ-র) দু'টি শর্ত আরোপ করেছেন,

১. যদি যঈফ হাদীসটি 'আক্বীদার সাথে সম্পৃক্ত না হয়। যেমন- মহান আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত।

২. যঈফ হাদীসটি যদি শরীয়তের বিধানের সাথে সম্পৃক্ত না হয়। যেমন- হালাল হারাম সংক্রান্ত। (ঐ)

তবে এক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস যুগশ্রেষ্ঠ আলেম শাইখ নাসিরউদ্দিন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বেশ কঠোরতা আরোপ করে আরো কয়েকটি নীতিমালা পেশ করেছেন, তাঁর লিখিত "তামামুল মিন্না ফি তা'লিকে আলা ফিকহিস সুন্নাহ" কিতাবে। তিনি বলেছেন :

১. যঈফ হাদীস উল্লেখ করা জায়িয নেই তবে বর্ণনার সময় যঈফের বিষয়টা বর্ণনা করতে হবে।

এক্ষেত্রে উচিত হলো, যদি যঈফের বিষয়টা জানা থাকে তাহলে বিষয়টি বর্ণনা করবে, আর যদি জানা থাকার পরেও না বলে তাহলে সে রাসূলের কঠোর হুঁশিয়ারি বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو احد الكاذبين.

"কোনো ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করে, যার সম্পর্কে সে ধারণা করে যে তা মিথ্যা তাহলে সে হবে মিথ্যুকদের একজন।[৪০]

এজন্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আহমদ মুহাম্মদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন :

والذي آراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال.

আমি মনে করি প্রত্যেক অবস্থাতেই যঈফ হাদীসের দুর্বলতা বর্ণনা করা ওয়াজিব।[৪১]

২. যঈফ হাদীস দ্বারা ফাজায়েলে 'আমল, 'আমল করা বর্জনীয়।

ফাজায়েলে 'আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য কিনা সেই ব্যাপারে আলেমের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। তবে কতিপয় আলেমের কাছে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের উপর 'আমল করা জায়িয। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে কোনোমতেই যঈফ হাদীসের উপর 'আমল করা যাবে না। সেজন্য তাঁরা কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। ইমাম মুসলিম স্বয়ং বাব রচনা করেছেন,

باب النهي عن الرواية عن الضعفاء و الإحتياط في تحملها.

---

* *অধ্যয়নরত দাওরায়ে হাদীস, শেষ বর্ষ, মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

[৩৮] *মুকাদ্দমা ইবনু সবালাহ- পৃ. ২০।*

[৩৯] *তাইসিরু মুসত্বলাহিল হাদীস- পৃ. ৫১।*

[৪০] *সহীহ মুসলিম মুকাদ্দমা- পৃ. ৬।*

[৪১] *আল বায়েসুল হাদীস- আহমদ মুহাম্মদ শাকের, পৃ. ৮৬।*

“যঈফ রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা নিষিদ্ধকরণ এবং তা বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন।”[৪২]

৩. যঈফ হাদীসের ক্ষেত্রে বলা যাবে না রাসূল (ﷺ) বলেছেন, অথবা তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে অথবা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা নিষেধ। কেবল ব্যবহার করতে পারবে সিগাহে তামরীজ তথা মাজহুলের সিগাহ (কর্তাকে উহ্য রেখে বর্ণনা করা)।

জাল হাদীসের পরিচয় : ডক্টর মাহমুদ ত্বহান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله (ﷺ).

“রাসূল (ﷺ)-এর দিকে সম্পর্কিত বানোয়াট মিথ্যা হাদীসকে মাওযূ‘ বা জাল হাদীস বলে।

সকল আলেমের মতে, জাল হাদীস বর্ণনা করা হারাম। কেউ যদি জেনে শুনে জাল হাদীস বর্ণনা করে, নিঃসন্দেহে সে রাসূল (ﷺ)-এর কঠোর হুঁশিয়ারি বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। কবীরাহ গুনাহগার হবে এবং ইসলামী শরীয়তের চরম ধৃষ্টতার শামিলকারী ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

হাদীস কি সহীহ, যঈফ, জাল হয়?

হাদীস কি সহীহ, যঈফ, জাল হয় এ প্রশ্ন শুধু আম জনতার নয়; বরং এ প্রশ্ন আম জনতা থেকে শুরু করে এক শ্রেণির আলেমের মধ্যেও ঘুরপাক খায়। তারাও বলে হাদীস আবার যঈফ, জাল হয়? তাদের এ বক্তব্যের যুক্তি হলো, রাসূল (ﷺ)-এর সব কথাই গ্রহণযোগ্য, অনুসরণীয়। তার কথাতে কোনো দুর্বলতা নেই; বরং তিনি তার গোটা জীবনে হক্ব, সত্য কথা বলেছেন। তিনি কখনও মিথ্যা কিংবা দুর্বল কথা বলেননি। কথাটি নিঃসন্দেহে সঠিক যে, রাসূল (ﷺ)-এর মুখনিঃসৃত কথা বিশুদ্ধ। তাঁর কথার মধ্যে কোনো মিথ্যার লেশমাত্র পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু যখন কেউ স্বার্থের লোভে কিংবা নিজের নাম কামানোর উদ্দেশ্য করে রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসের সাথে নিজের বানানো কথা মিশ্রণ করে তাহলে তো সেই কথা জাল হবেই। আদৌ সেই কথা কি রাসূল (ﷺ)-এর কথা, ভাষ্য বলে গণ্য হবে? নিঃসন্দেহে জবাব হবে– না। উদাহরণস্বরূপ রাসূল (ﷺ) সহীহ হাদীসে বলেছেন :

أَنَا خَاتَمِ النَّبِيِّ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

“আমি সর্বশেষ নবী আমার পরে আর কোনো নবী নেই।”

এই হাদীসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই হাদীসকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণির ভণ্ড নবী দাবিদার ও তার দোসররা জাল হাদীস তৈরি করে এই বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে মিশ্রণ করে তাদের কল্পিত বানানো কথা–

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ.

“তবে যদি আল্লাহ চান।”[৪৩]

এই বক্তব্য ওই সহীহ হাদীসের সাথে লাগিয়ে তারা নবী দাবিদারের পথকে উন্মুক্ত করতে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। জনসাধারণের বিবেককে নাড়া দেয়ার মতো মূল জায়গায় হাত দিয়েছে তারা। কারণ হলো আল্লাহ তা‘আলা চাইলে কিনা সম্ভব। তিনি চাইলে তো সবই সম্ভব। নবী, রাসূলও আবার পাঠানো সম্ভব। এভাবে মানুষকে প্রতারিত করার হীন প্রচেষ্টা চালানোর জন্য জাল হাদীস তৈরি করে। ঠিক অনুরূপ আরেকটি হাদীস লক্ষণীয়–

النظر إلى وجه المرأة الحسناء والخضرة يَزِيْدَانِ في البصر.

“রাসূল (ﷺ) বলেছেন : সুন্দরী নারীর দিকে তাকালে আর সবুজ (শাক সবজি গাছপালার) দিকে তাকালে চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধি পায়।”

এই হাদীস যে মিথ্যা, তা বলার অবকাশ রাখে না। মিথ্যা হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, নারীর দিকে তাকালে চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধি পায়। অথচ ইসলামী শরীয়তে বেগানা নারীর দিকে তাকানো হারাম। হঠাৎ একবার চোখ পড়লে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ এই হাদীস কি অদ্ভুত রকমের কথা বলছে। তা তো কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষও মানতে পারবে না। এমনকি যদি এই হাদীস সহীহ ধরে নেয়া হয় তাহলেও তো বড় ধরনের সমস্যা। কারণ ইসলাম বিদ্বেষী, নাস্তিকরা এই হাদীসকে রেফারেন্স করে ইসলামকে কলুষিত করার পাঁয়তারা চালাবে। সুযোগ নিয়ে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। অথচ হাদীসটি জাল।

তাহলে হাদীস যদি জাল, য‘ঈফ না হতো তাহলে এ হাদীসগুলো তো ইসলামী শরীয়তের জন্য বড়ো সমস্যার কারণ হতো। আর তাছাড়া হাদীস জাল, য‘ঈফ এবং এক শ্রেণির প্রতারক, মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে বলেই রাসূল (ﷺ) মারাত্মকভাবে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন তাঁর জীবদ্দশায়। খোদ শিয়া সম্প্রদায় তো তিনলক্ষ হাদীস জাল তৈরি করে সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাহলে আপনি কিভাবে সব হাদীসকে সহীহ মনে করে ‘আমল করবেন? নিঃসন্দেহে হাদীসের মানে তারতম্য বিদ্যমান। তাই হাদীসের মান জাল, য‘ঈফ হয় এটি মানতে হবে, গ্রহণ

---

[৪২] *সহীহ মুসলিম- মা. শা., ১/৯।*

[৪৩] *সহীহুল বুখারী- ৯/১৩৭।*

করতে হবে। নইলে মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এই কঠোর হুঁশিয়ারি দিতেন না। দুনিয়ার জীবনে যেমন ভালো মন্দ যাচাই বাছাই করে কোনো কিছু কিনতে সিদ্ধান্ত নেন, ঠিক তেমনি ইসলামী শরীয়তে হাদীসের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদল গোত্রের আর শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অনেকেই অনেক সময় মিথ্যা, জাল হাদীস তৈরি করে সমাজে ছড়িয়ে দেয়। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে হাদীসও জাল, য'ঈফ হয়।

জাল হাদীস তৈরির কারণ :

১) السياسة (রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট) : জাল হাদীস তৈরির অন্যতম কারণ হলো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে শিয়া সম্প্রদায়। তারা প্রায় তিনলক্ষ হাদীস জাল তৈরি করে সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা মূলত 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), তার খেলাফত ব্যবস্থা ও তার আহলে বাইতকে কেন্দ্র করে জাল হাদীস তৈরি করেছে। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খেলাফত সময়ে ইসলামের রাজধানী হয় ইরাকের কুফা নগরী। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মৃত্যুর পর তারা তাঁর গুণকীর্তন, প্রশংসা বৃদ্ধি করার জন্য অসংখ্য মিথ্যা হাদীস তৈরি করে। এজন্য ইমাম শিহাব যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন :

يخرج الحديث من عندنا شبرا فيرجع إلينا من العراق ذراعا.

"আমাদের কাছ থেকে বের হওয়া এক বিঘত হাদীস ইরাক থেকে এক হাত হয়ে ফিরে আসে।"

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ-র) ইরাককে دار الضرب তথা হাদীস ভাঙ্গার কারখানা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু শিয়া সম্প্রদায় 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইমাম হিসেবে মানে তাই তাঁর মর্যাদা, সম্মানের জন্য জাল হাদীস তৈরি করে। এদিক লক্ষ্য করে ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : আমি মিথ্যা হাদীস তৈরি করার ক্ষেত্রে শিয়াদের চাইতে অধিক আর কাউকে দেখিনি।

তাদের জাল হাদীসের সীমা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। যেমন-

১) খুমে কুয়ার ঘটনা : রাসূল (ﷺ) বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পথে খুম কুয়া নামক একটি জায়গায় লক্ষাধিক সাহাবীর সামনে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাত ধরে বলেন :

هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي فأسمعوا له وأطيعوا.

"ইনি হলেন আমার অসি, আমার ভাই এবং আমার পরবর্তী খলিফা অতএব তোমরা তাঁর কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে।"

পক্ষান্তরে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বিরোধিতা পোষণকারী বলেন :

إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه.

"যখন তোমরা মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আমার মিম্বরের উপর দেখবে তখন তোমরা তাঁকে হত্যা করবে।"

এদিকে আবার মু'আবিয়াহ্ সমর্থকরা বলেন :

أنت مني يا معاوية و أنا منك.

হে মু'আবিয়াহ্! তুমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমি তোমার পক্ষ থেকে।

২) الواعظين (বক্তা ও গল্পকার) : বক্তা ও গল্পকারের মাধ্যম জাল হাদীস তৈরি হয়। তারা মানুষের কাছে বাহবা, সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে জাল হাদীস তৈরি করে সমাজে ছড়িয়ে দেয়। অর্থ-কড়ির লোভ, দুনিয়া উপার্জন ছাড়াও তারা জন প্রসিদ্ধি লাভের আশায় এমন হীন কাজ করতে মোটেও দ্বিধাবোধ করেনি। উল্লেখযোগ্য একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা–

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন (রাহিমাহুল্লাহ-র) এক মসজিদে নামায আদায় করে দেখেন একজন লোক জনগণকে একত্রিত করে হাদীস বর্ণনা করে শুনাচ্ছে আর বলছে এটা আহমদ বিন হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন (রাহিমাহুল্লাহ-র) বর্ণনা করেছেন। তারা এটা শুনে পরস্পরের প্রতি তাকিয়ে বলেন, আপনি কি এটা ওনাকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। উভয়ের জবাব– না। তখন তাঁরা ঐ ব্যক্তিকে ডেকে বলেন– আমি আহমদ বিন হাম্বল ও আমি ইয়াহইয়া বিন মাঈন, কই আমরা তো তোমাকে এই হাদীস বর্ণনা করে শুনাইনি। তখন লোকটি বলল : আমি এতদিন ভেবেছিলাম আপনারা অনেক বড়ো জ্ঞানী এখন তো দেখি আপনারা অনেক বোকা। লোকটি বলল : আমি ১৭ জন আহমদ ও ইয়াহইয়া থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি। আপনারা ছাড়া কি দুনিয়াতে আহমদ, ইয়াহইয়া নেই।

৩) التقرب إلى الله تعالى (মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য) : মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কতিপয় পরহেজগার, 'ইবাদতগুজার ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহমুখী, পরকালমুখী করার জন্য জাল হাদীস তৈরি করে। উদ্দেশ্য দুনিয়া বর্জন করে আখিরাতমুখী করা।

'ইবাদতে মশগুল থাকা। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো– মাইসারা বিন আবদে রাব্বিহর ঘটনা। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো– এসব হাদীস কোথা থেকে এসেছে, কোথা থেকে বর্ণনা করেন? যে অমুক সূরা পড়লে এত সওয়াব, অমুক সূরা পড়লে এত প্রতিদান। তিনি বলেন : আমি মানুষকে আগ্রহী করার জন্য বানিয়েছি।

৪) الإنتصار للمذهب (মাযহাবকে সাহায্য করা অথবা মাযহাবী তাকলীদ) : মাযহাবকে কেন্দ্র করে হাদীস জাল তৈরি করা হয়। মাযহাবী কোন্দল, গোঁড়ামি এবং ইমামদের নিয়ে অতি ভক্তি, সম্মান, শ্রদ্ধা করে তাঁরা এক ইমামের উপর আরেক ইমাম, এক মাযহাবের উপর আরেক মাযহাবের প্রাধান্যের জন্য জাল হাদীস তৈরি করে। এক্ষেত্রে শিয়ারাও পিছে ছিল না। শিয়ারা বলে–

علي خير البشر من شك فيه كفر.

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে তার ব্যাপারে সন্দেহ করবে সে কুফ্রী করল।[৪৪]

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র অনুসারীগণ তথা হানাফীগণ ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)-কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেন : রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে মুহাম্মদ বিন ইদরীস (শাফে'য়ী) নামে একজনের আবির্ভাব হবে। সে ইবলিসের চেয়েও ক্ষতিকর হবে এবং আবূ হানীফাহ্ নামে একজন হবে, যিনি হলেন আমার উম্মতের সূর্য সমতুল্য।

তাঁরা আরেকটু এগিয়ে জাল হাদীস তৈরি করে বলে : রাসূল (ﷺ) বলেছেন, সকল নবী আমার কারণে গর্ব করে থাকে এবং আমি আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র কারণে গর্ব করে থাকি।

এভাবে এক মাযহাবের অনুসারী স্বীয় মাযহাবকে অপর মাযহাবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে জাল হাদীসের অবতারণা করেছে। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁদের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এভাবে–

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর জীবনের শেষ হজ্জে গিয়ে কাবা ঘরে প্রবেশ করে প্রতি কদমে অর্ধেক কুরআন খতম করে অতঃপর নামাযে গায়েবি আওয়াজ শুনতে পায় : আবূ হানীফাহ্! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং ক্ষমা করলাম তাদেরকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তোমার মাযহাবের অনুসারী হবে।

এই সকল হাদীস পেশ করে মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : মুহাদ্দিসগণ সকলেই এই হাদীসগুলোকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৫]

৫) ফিকহী বিরোধ : হাদীস জাল তৈরির ক্ষেত্রে আরেকটি কারণ হলো ফিকহী বিরোধ। মাযহাবী ফিকহের পারস্পরিক বিরোধের ফাঁদে পড়ে স্ব স্ব মাযহাবী ফিকহ রক্ষায় জাল হাদীস তৈরি করা হয়। যেমন-

১. হানাফী মাযহাবে নামাযে রফউল ইয়াদায়েন 'আমল করে না। অথচ এই 'আমল বাকি তিন মাযহাবে প্রসিদ্ধ। তাই হানাফী মাযহাবের ফিকহ রক্ষায় তারা হাদীস বানালো–

من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له.

"যে ব্যক্তি নামাযে রফউল ইয়াদায়েন করবে তাঁর নামায বাতিল।"

২. আরো একটি–

من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا.

"যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের পেছনে কিছু পাঠ করবে তাঁর মুখ জাহান্নামের আগুনে ভর্তি করা হবে।"

যেহেতু হানাফী মাযহাবে ইমামের পিছনে জেহরী নামাযে কিরআত পড়া নিষেধ তাই তারা এই হাদীস তৈরি করেছে। অথচ উপরিউক্ত দুই জাল হাদীসের বিপরীতে অসংখ্য সহীহ হাদীস বিদ্যমান এবং সালাফদের 'আমলের দলিল কিতাবে জ্বলজ্বল করছে।

তাঁরা এভাবেই ফিকহী বিরোধের কবলে সময়ের প্রেক্ষাপটে হাদীস জাল করেছে কেবল ফিকহী বিষয়ে অন্যের তুলনায় নিজের ফিকহকে প্রাধান্য দিতে এবং গ্রহণযোগ্য করার জন্য এমন হীন কাজ করেছে।

৬) التزلف إلى الحكام (সরকারের মনঃতুষ্টি অর্জন) : সরকারের মনঃতুষ্টি অর্জনের জন্য কতিপয় দুর্বল ঈমানের অধিকারী জাল হাদীস তৈরি করে। এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো–

এক সময় গিয়াস বিন ইব্রাহীম নামে একজন আলেম 'আব্বাসীয় যুবরাজ মাহদীর দরবারে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি কবুতর নিয়ে খেলছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই আলেম একটি মশহুর হাদীস বলেন :

«لَا سَبَقَ إِلَّا فِيْ نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ».

[৪৪] *তাইসিরু মুসত্বলাহিল হাদীস- পৃ. ১/১১৩।*

[৪৫] *মওজুয়াতে কাবীর- ২৭ পৃ.।*

(জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৭০০, সহীহ) হাদীসের শেষে أو جناح শব্দটি যোগ করে দেন এবং তিনি বর্ণনা করে শোনান : প্রতিযোগিতা নয় তিনটি বিষয় ছাড়া। তীর নিক্ষেপ, উট চালানো এবং ঘোড়া সওয়ারীতে।[৪৬]

ওই আলেম তার সঙ্গে যোগ করে– “এবং কবুতর বাজিতে”। এটা শুনে যুবরাজ মাহদী তাকে খুশি হয়ে দশ হাজার দিরহাম নগদ বখশিশ দেয়।

জাল হাদীস তৈরি করায় খারেজীদের তেমন ভূমিকা নেই : জাল হাদীস তৈরির ক্ষেত্রে শিয়া সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী। ৩৭ হিজরির পর ‘আলী ও মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মধ্যকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়। এটা কেন্দ্র করে বিভিন্ন দল, উপদল, গোত্র তৈরি হয়। ফলে বিদআতী ফির্কাগুলো জাল হাদীস তৈরি করতে শুরু করে। তবে এক্ষেত্রে খারেজী সম্প্রদায় তেমন কোনো ভূমিকা পালন করেনি। কারণ খারেজীদের ‘আক্বীদাহ্ হলো– কেউ যদি কবীরা গুনাহ করে তাহলে সে কাফির, জাহান্নামি। তাঁরা তাঁকে মুসলিম মনে করে না। তাই যেহেতু রাসূল (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা কথা বলা, হাদীস জাল তৈরি করা কবিরা গুনাহ তাই তারা এই কাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে। এজন্য ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : বিদআতীদের মধ্যে খারেজীদের চাইতে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী আর কেউ নেই।

অনুরূপভাবে ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : খারেজীরা সততায় প্রসিদ্ধ। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহ বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত।[৪৭]

জাল ও য‘ঈফ হাদীসের কিছু কিতাবের নাম : ১) কিতাবুল মওজূয়াত- লেখক : ইবনু জাওযী (৫৯৭ মৃত্যু)। **২)** তাযকিরাতুল মওজূয়াত- লেখক : মুহাম্মদ তাহের হিন্দী (৯৮৬)। **৩)** মাওজূয়াতে কাবীর- লেখক : মোল্লা ‘আলী ক্বারী হানাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র) (১০১৪)। **৪)** আল লা‘আলিল মাসনাহ- লেখক : জালালুদ্দিন সুয়ূতি (৯১১)। **৫)** কাশফুল খেফা- লেখক : আল আজলুনী (১২৬২)।

জাল ও য‘ঈফ হাদীস প্রতিরোধে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব : আল্লাহ তা‘আলা মুসলিম উম্মাহকে বানিয়েছেন মধ্যমপন্থী জাতি এবং ন্যায় ও সত্যের বলিষ্ঠ চেতনার বাহক, প্রচারক হিসেবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا﴾

“আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন।”[৪৮]

মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব কর্তব্য হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া কুরআন ও সহীহ হাদীসকে আঁকড়ে ধরে থাকা এবং যাবতীয় জাল, য‘ঈফ, মিথ্যা, ভিত্তিহীন কিচ্ছা-কাহিনি বক্তব্য বর্জন করা এবং সেই সাথে কোনো কিছু গ্রহণ ও বর্জন করার নীতি অবলম্বন করা। এজন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক্ব তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখো, এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।”[৪৯]

শরিয়তের বিষয়ে যাচাই বাছাই না করে কোনো তথ্য গ্রহণ কিংবা বর্জন করা মোটেও ঠিক নয়। তাই ইসলামী শরীয়তের এই নীতিমালা অনুসরণ করলে আশা করা যায়, সমাজে জাল ও য‘ঈফ হাদীসের কুপ্রভাব কমে আসবে এবং দলিলনির্ভর একটি আদর্শিক সমাজ গড়ে ওঠবে। সেই সাথে বিশুদ্ধ ‘আমলের একটি সুন্দর সমাজের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুটিত হবে ইন্‌শা-আল্লাহ। পরিশেষে খতিব বাগদাদী (রাহিমাহুল্লাহ-র)’র ৫ম শতকের সময়ের বাস্তবতা পেশ করার মাধ্যমে আলোচনার ইতি টানলাম। তিনি বলেছেন :

এ যুগে হাদীস অনুসন্ধানকারীদের বেশিরভাগের অবস্থা এই যে, হাদীসের মাশহুর কিতাবগুলো ছেড়ে অপরিচিত হাদীসগুলো তারা শোনে। দোষযুক্ত ও য‘ঈফ রাবীদের হাদীস শ্রবণে মেতে থাকে। যাতে অসামঞ্জস্য ও ভুল পাওয়া যায়।[৫০] ❑

---

[৪৬] *মুসনাদে আহমাদ।*
[৪৭] *আস্ সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা- ড. মুসতফা সিবাঈ।*
[৪৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৪৩।*
[৪৯] *সূরা আল হুজুরা-ত : ৬।*
[৫০] *আল কিফায়াতু ফি ইলমিল রিওয়ায়াহ- ১৮৮ পৃ.।*

দৃষ্টি হেফাজতে মেলে আল্লাহর সন্তুষ্টি

–মেহেদী হাসান সাকিফ*

দৃষ্টিশক্তি আমাদের জীবনে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সবচেয়ে বড়ো নিয়ামতগুলোর একটি। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিই কেবল অনুভব করতে পারেন দৃষ্টিশক্তি কী জিনিস। দুনিয়ার কোনো সৌন্দর্য আলো-বাতাস তারা দেখতে পারে না। আমাদের প্রতিনিয়ত উচিত আল্লাহ প্রদত্ত এই নিয়ামতের কদর করা। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ দৃষ্টিশক্তির যথাযথ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

"মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত।"[৫১]

আল্লাহ তা'আলা এখানে পুরুষদের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি নারীদেরকেও দৃষ্টি সংবরণের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

"আর মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে।"[৫২]

চক্ষুকে বলা হয়ে থাকে মনের আয়না। মানুষ প্রথমে চোখ দিয়ে দেখে তারপর হৃদয় দিয়ে কল্পনা ও কামনা করে। পরবর্তীতে তা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কার্যে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায়। চক্ষুর যত্রতত্র দৃষ্টিপাতে মানব হৃদয় অশান্ত অস্থির হয়। এমনও পুরুষ রয়েছে যে একজন বেগানা নারীর প্রতি মাত্র একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছে যার ফলশ্রুতিতেই সে বছরের পর বছর অন্তর্দহন ভোগ করেছে। যেকোনো ধরনের বড় পাপে বান্দার নিমজ্জিত হওয়ার প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে দৃষ্টি। পথেঘাটে হাটবাজারে বিপনি-বিতানে বেগানা নর-নারীর ওপর ভুলক্রমে আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হতেই পারে। পরক্ষণে সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি অবনমিত করতে হবে। ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিকে সেখানে প্রলম্বিত করা যাবে না। এ পরিস্থিতি সম্পর্কে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে রাসূল (ﷺ) বলেন :

'হে 'আলী! অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি পড়ে গেলে পুনরায় তুমি দৃষ্টি দিও না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য ক্ষমাযোগ্য কিন্তু পুনরায় দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য ক্ষমাযোগ্য নয়।'[৫৩]

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে প্রতিমুহূর্তে আমাদের দৃষ্টির খেয়ানত হচ্ছে। টেলিভিশনে পর্দা খুললে, স্মার্টফোনে ফেসবুকে, ইউটিউবে, ইন্টারনেটে ভেসে উঠছে খোলামেলা বেপর্দা নারীর দৃশ্য। এছাড়াও বর্তমানে ব্যাপকভাবে ইভটিজিং, পরকীয়া, ধর্ষণ বৃদ্ধির কারণও চক্ষুর লাগামহীন যত্রতত্র ব্যবহার। দৃষ্টিশক্তির সামান্য একটু অপব্যবহারের ফলে বহু বছরের সুখীসংসারে ভাঙন ধরছে। দৃষ্টিশক্তির খিয়ানতের আগুনে পুড়ে সংসার জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'দৃষ্টিই যৌন লালসার উদ্বোধক। কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌনাঙ্গেরই সংরক্ষণ। যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে অবাধ, উন্মুক্ত ও সর্বগামী করে সে নিজেকে নৈতিক পতন ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মানুষ নৈতিকতার ক্ষেত্রে যত বিপদ ও পদস্খলনেই নিপতিত হয়, দৃষ্টিই তার মূল কারণ। কেননা দৃষ্টি প্রথমত আকর্ষণ জাগায়। আকর্ষণ মানুষকে চিন্তা বিভ্রমে নিমজ্জিত করে। আর এ চিন্তাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে লালসার উত্তেজনা। এ যৌন উত্তেজনা ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। আর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়। এ দৃঢ় সংকল্প অধিকতর শক্তি অর্জন করে বাস্তবে ঘটনা সংঘটিত করে। বাস্তবে যখন কোনো বাধাই থাকে না, তখন এ বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে কারো কোনো উপায় থাকে না।'[৫৪]

দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামত উপভোগ্য হওয়ার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে চক্ষু। আমাদের দুনিয়ার জীবনকে সুখময় ও পরকালের নাজাতকে নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চক্ষুকে ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর ওয়াদা :

"যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার 'আযাব বড় কঠিন।"[৫৫]

সুতরাং আমরা যদি দৃষ্টির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করি আল্লাহ তাহলে আমাদেরকে তা থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে বহুগুণ উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দিবেন। কিন্তু যদি এর অপব্যবহার করি যেকোনো সময়ে আল্লাহ তা ছিনিয়ে নিতে পারেন।

আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে আমরা নিষিদ্ধ কার্য থেকে বিরত রাখবো। চক্ষু দিয়ে মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহ হৃদয় থেকে পর্যবেক্ষণ করে ঈমান বৃদ্ধি করব। মহান আল্লাহর বড়ত্ব মহত্ত্ব কিছুটা হলেও বুঝতে সক্ষম হব। দৃষ্টি সংযত করলে ঈমান মজবুত হয়। অন্তরে ঈমানের স্বাদ লাভ হয়। চেহারায় নূর সৃষ্টি হয়। একজন বান্দা 'ইবাদতের প্রকৃত তৃপ্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও বান্দা তার যাবতীয় জাগতিক কাজকর্মে পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করতে পারে। অনেক সময় যারা যত্রতত্র দৃষ্টিপাত করে তাদের কাজকর্মে বিপুল পরিমাণ মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটতে দেখা যায়। ❑

---

* *ইসলামবিষয়ক লেখক ও প্রাবন্ধিক। বিএ অনার্স, (সম্মান) প্রথম শ্রেণী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাস্টার্স শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত।*

[৫১] *সূরা আন্ নূর : ৩০।*

[৫২] *সূরা আন্ নূর : ৩১।*

[৫৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৭৭৭, হাসান।*

[৫৪] *আল জাওয়াব আলকাফি- ২০৪।*

[৫৫] *সূরা ইব্রা-হীম : ০৭।*

আলোকিত জীবন

স্মৃতির আরশিতে আমার শিক্ষক এ বি এম হোসেন

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

অন্তত: ৪৮ বছর আগের কথা। সে হিসেবে সালটা ১৯৭৫। এই সালেই স্যারের সাথে আমার প্রথম দেখা ও পরিচয়। স্যার তখন বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে পঁচাত্তর সালের মাঝামাঝিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তির জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। যথাসময়ে চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য সাক্ষাৎকার।

স্যার শহীদুল্লাহ কলা ভবনের নীচের একটা কক্ষে বসতেন। নীতিদীর্ঘ আয়তাকারের কক্ষটিতে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। স্যারের বসার একটা কুশন চেয়ার। সামনে খান তিনচারেক হাতল চেয়ার। আর চারদিকে হাতলবিহীন ১০/১৫টি চেয়ার। প্লাস্টিকের অপূর্ব গাঁথুনির চেয়ারগুলো বসতে আরামদায়ক ছিল। স্যারের কক্ষ বারান্দার পশ্চিমে চতুষ্কোণাকৃতির এক চিলতে সবুজ চত্বর। চারদিকে নানা পদের পাতাবাহারের গাছ।

প্রথম দিকে নাম থাকার কারণে প্রায় শুরুতেই ডাক পড়লো। ঢুকতেই আদিষ্ট হলাম 'বস'। বসলাম। স্যার আপাদমস্তক অবলোকন করে কতকটা সহানুভূতির স্বরে বললেন, কোত্থেকে এসেছো। কম্পিত কণ্ঠে : দিনাজপুর। এখনও মনে আছে নাদিরশাহ কেন এবং কখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন। জানা উত্তর। তাই অকপটে জবাব দিলাম। কিন্তু আমার জবাবের সুরে স্যারের কাছে প্রতিপন্ন হলো যে, 'দেশটি আমাদের ও সে ঘৃণিত শত্রু'। স্যার, হো হো করে হেসে ফেললেন। আমি তো হতচকিত হয়ে পড়ি। এক পর্যায়ে তাঁর সহানুভূতি ও পরিতুষ্ট সুরের অভিব্যক্তিতে অনুভূত হলো, যখন জানলেন যে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে একটি পত্রের অর্জিত নম্বরের শতকরা হার ছিল ৮২। স্যার, বললেন পড়বে তো? আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়া দিলাম। পরে আরও ২/১টা বিষয়ে সুযোগ এসেছিল। কিন্তু স্যারকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি নি।

আজকের মতো তখন সেমিষ্টার সিস্টেম ছিল না। পুরো তিন বছর পঠিত বিষয়ের উপর লিখিত পরীক্ষা হতো এবং এক মাসের মধ্যেই। অনেককে দেখতাম রীতিমত মাথা ন্যাড়া করে ফেলতো। এমনি একজন ছিলেন আমীর আলী হলের আনিস ভাই। লাগাতার পরীক্ষার উদ্‌গীরিত গরম যেন তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। আমাদের শামসুজ্জোহা হলের পুকুর গোসল করতে আসতেন। তাকে সেভাবেই আবিষ্কার করে আমরা মজা করতাম। আমাদের হলে একজন ছিল নাম নর্টন। মূল নাম মনে নেই। সে তো হরহামেশা ন্যাড়া করে আসল পরীক্ষার্থীর 'সিরিয়াসনেস' বন্ধুমহলে তুলে ধরতো।

যাহোক, ক্লাস শুরু হলো। কিন্তু স্যার অনার্সের ক্লাস নিতেন না। অগত্যা মাঝে মধ্যে কুশলবিনিময় হতো মাত্র তবে গর্বিতভাব নিয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পড়বার স্বার্থকতা খুঁজে ফিরতাম। স্যারের কারণে, স্যারকে ঘিরে। এই তিন বছরের মধ্যে কখনো কখনো স্যারের নানান মহিমাময় প্রপঞ্চ আমাকে উৎসাহিত করত। আমার যতদূর মনে পড়ে আমাদের বিভাগে আর একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। নাম ড. শফিউদ্দীন জোয়ার্দার। হার্ভাডে পি-এইচ ডি করেছিলেন। স্যার সম্ভবতঃ লিয়েনে কিংবা ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় গিয়েছিলেন। একদিন তাঁর বিদায়ের প্রাক্কালে শহীদুল্লাহ কলাভবনের সামনে রাস্তায় এক বিরল ঘটনার স্বাক্ষী হই। জোয়ার্দার স্যারকে তিনি শুধু নাইজেরিয়া নয়; ঐ সকল অঞ্চলের অন্যান্য দেশের মুসলমানদের সামাজিক ও সাংকৃতিক ঐতিহ্যের চমৎকার বিষয়গুলোর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

ইসলামের ইতিহাস বলতে অনেকের কপালে অনাগ্রহের ভাঁজ পরিলক্ষিত হত। সপ্তম শতকে ইসলামের নামে গড়ে উঠা সভ্যতা ছিল সমকালীন বিশ্বের বিস্ময়। এটি যে মানুষ ভুলতে বসেছে। ড. এবিএম স্যার এদিকটার প্রতি কড়া নজর রাখতেন। অষ্টম শতকে ঐ সকল অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার অসভ্য বার্বারদের মাঝে জীবনাচারে বিপ্লব এনে দিয়েছিলে। এগুলোর প্রতি

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

পুনর্বার দৃষ্টি আকর্ষণই ছিল তার অন্যতম লক্ষ্য। সম্ভবতঃ জোয়ার্দার স্যারকে অনুরোধের পেছনে এটি ছিল অন্যতম কারণ।

আধুনিক যুগে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে এবং মিসর ও সুদান সম্পর্কে স্যারের বরাবর আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। তিনি ওই সকল অঞ্চলের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ক্রমাবনতি ও দুর্দশার বিষয় অবগত ছিলেন। একজন সফল ইতিহাসবিদ হিসেবে সে সকল রাষ্ট্র ও জনজীবনের সোনালী অতীতকে তুলে ধরা এবং তা পূণর্জীবনের প্রয়াস অব্যাহত রাখা তার ব্রতছিল।

স্যার কিন্তু ইসলাম স্থাপত্য ও শিল্পকলার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। আলাপচারিতায় ক্রেসওয়েলের সাথে স্যারের সখ্যতা ও বিতর্কের বিষয়ও জেনেছি। আরবসভ্যতা ও ঐতিহ্যের প্রতি স্যারের অনুকম্পা পণ্ডিত মহলে সমাদৃত হয়েছে। ইসলামি স্থাপত্য হবে না আরব স্থাপত্য হবে এটি নিয়ে ক্রেসওয়েলের সাথে চমৎকার ও রসঘন বিতর্কের কথা আমি শুনেছি। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়কে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে স্যারের আগ্রহের কমতি ছিল না।

ইতিমধ্যে আমার জীবনের তিনটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কার্যত: সময় গেছে ৪ বছর। সেসনজটের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে বছরের পর বছর। অবশেষে অনার্সের ফল প্রকাশিত হলো। ভর্তি হতে হবে। কীসে? ঐতো আমার স্যার এবিএম হোসেনের 'সি' গ্রুপে Islamic Art and Architecture। হালে নামকরণ হয়েছে Muslim Art and Archaeology। ক্লাস শুরু হলো। স্যারের আরব স্থাপত্য ও কে এ সি ক্রেসওয়েলের Islamic Architecture ইত্যকার বই নিয়ে পড়াশোনা শুরু হলো। স্যারের সাথে ক্লাস হতো ঐসে নীচের কক্ষে। আশ্চর্য ব্যাপার স্যারকে ক্লাস কোনদিন বাদ দিতে দেখিনি। ১১টার ক্লাস। শীতকালে কলা ভবনের গাড়ি বারান্দায় অপেক্ষা করতাম। মিষ্ট রোদের আমেজঘন পরিবেশে চিত্তের দাবি পূরণ করতে মিনিট দশেক আগেই পৌছুতাম। নাহ্! এক মিনিট পরেও নয় ঠিক এগারটার সময় স্যার তাঁর বিশালাকার অষ্টিন গাড়ি হাকিয়ে গাড়ি বারান্দায় পৌঁছিয়ে যেতেন। মোখলেছুর রহমান স্যার হাসতে হাসতে বলতেন তোমার স্যারের বোয়িং চলে গেল।

প্রবল আগ্রহ আকাঙ্খা ও পরিচ্ছন্নতার একনিষ্ট প্রতীক ছিলেন ড. হোসেন। একবার স্যার তার গাড়িটি ডেন্টিং-এর জন্য ওয়ার্কসপে পাঠান। তিনি বলেছিলেন, কাজ এমনভাবে করো, 'যেন আমার ছবি দেখা যায়'। স্যার, কালো সু পরতেন। মনে হয় নিত্যদিন ব্রাশ করতেন। জুতার চামড়াতে নানা প্রতিকৃতি বিম্বিত হতে দেখেছি।

ক্লাস চললো। আরও দু'বছর পেরিয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলাম। ফলাফল ততটা ভালো ছিল না। ওই গ্রুপে প্রথম হয়েছিলাম। সেবার অবশ্য কোন গ্রুপে কেউই প্রথম শ্রেণি পায়নি। যাহোক স্যারের সাথে সান্নিধ্যের প্রায় ৮টি বছর কেটে গেছে। মাস্টার্স শেষে পি-এইচডি করবো না বিসিএস করবো এমনি টানা পোড়নের মাঝে ১৯৮৫ সালে বিসিএস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলাম। প্রথম সুযোগেই উত্তীর্ণ হলাম। চাকুরী হলো। তবে স্যারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। এন এস সরকারি কলেজ নাটোরে যোগদান করেই প্রায়ঃশ স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করতাম। একজন মহান শিক্ষাব্রতীর আকর্ষণ সদা অনুভব করতাম। বছর কয়েক পরে স্যারকে গবেষণার বিষয় অনুরোধ করলে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। ছাত্রত্বকালীন রেজিস্ট্রেশনের আওতায় ভর্তি হয়ে পড়ি।

ইতিপূর্বে বলেছি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানচর্চায় স্যারের জুড়ি মেলা ভার ছিল। তিনি তার বিভাগ, বিষয়সমূহকে সমুন্নত করার জন্য অকপটে কাজ করতেন। অজানাকে জানার দুর্নিবার আগ্রহ তাকে মহান করেছিল এটি টের পেয়েছি বেশ পরে। আলোচনা হচ্ছিল : গবেষণার বিষয় কী হবে। স্যার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন, তোমার ম্যাডাম (প্রফেসর ড. শাহনারা হোসেন) ডিগ্রী করেছেন পালদের দৈনন্দিন জীবনের উপরে (Everyday Life in the Pala Empir)। তোমার ম্যাডামের আন্ডারে গবেষণা করে ডিগ্রী করেছে সেনদের সামাজিক জীবনের উপর। তাহলে তুমি করো সুলতানি আমলের প্রাত্যহিক জীবনের উপরে। জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক সেতু বন্ধন বিরচনে স্যারের ভূমিকা ছিল অসামান্য। তিনি বলতেন, একটি জাতির সমাজ ইতিহাস, ইতিহাসের পূর্ণতা দান করে। ইসলামি স্থাপত্য ও শিল্পকলার একনিষ্ঠ গবেষক হয়ে সুলতানি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনাবিষ্কৃত ও জীবনঘনিষ্ট গবেষণার তত্ত্বাবধান করে আমাকে ধন্য করেছেন।

ড. হোসেন একজন অদম্য ও সাধনা প্রবন ইতিহাসবিদ ছিলেন। লন্ডনে মাস্টার্স করতে গিয়ে নানা কৌতুহলোদ্দীপক হাস্যরসের অবতারণা করতেন। সেখানে গবেষণা করতে যাওয়া অনেক পণ্ডিতকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন। পরম মানবতাবাদী পণ্ডিত হোসেনের অনেক গল্প আমার জানা আছে। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সে সকল বর্ণনা থেকে বিরত রইলাম।

আমার সৌভাগ্য যে, তাঁর মতো একজন অমিতধর পণ্ডিত আমাকে চিনতেন। তাঁর অসামান্য বদান্যতা আমাকে তাঁর ছাত্র/গবেষক হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। গবেষণাকর্ম সম্পাদনে তিনি ছিল প্রখর। একবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক হাফিজুল্লাহ খান আমার সমকালীন স্যারের অধীনে পি-এইচডি গবেষক ছিলেন। খুব ঠিকঠাক করে নিয়ে এসে স্যারকে বললেন, এবার মনে হয় আর ভুল হবে না। স্যার, প্রথম পৃষ্ঠায় নজর বুলাতেই বড় ধরনের ভুল পেয়ে হো হো করে হেসে ফেললেন। হাফিজুল্লাহ খান ও হাসলেন। কিন্তু, পণ্ডিতের কাছে ব্যর্থতার সুমিষ্টগ্লানি তাঁকে বিচলিত করেনি; কিন্তু আরও সতর্ক হতে প্রেরণা যুগিয়েছিলে। তখন আমি স্যারের পাশে বসা, আমার পাঠ হলো।

স্যার দারুণ রকম যৌক্তিক ছিলেন। আদি উৎসের শেকড় সন্ধান ছিল তার স্বভাবজাত। আমার গবেষণার নানা বিষয়ের উৎস সন্ধানে আমাকে সদা উৎসাহিত ও তাগিদ করতেন। তাঁরই প্রেরণায় গৌড়, পাণ্ডুয়া ও কোলকাতার স্টেট মিউজিয়াম, জাতীয় জাদুঘর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে একাধিকবার গিয়েছি। প্রচুর পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরে জিজ্ঞাসা করে জবাব দিতে গিয়ে সাহস সঞ্চার করেছি। একবার তিনি একটা বিষয়ে সুরাহার জন্য বললেন, 'ওসমান গনী তুমি আজই ঢাকা যাও'। ড. আহমাদ হাসান দানী ঢাকায় এসেছেন। হোটেল শেরাটনের একটি কক্ষে অবস্থান করছেন। স্যারের হুকুম তামিল করতে কাল বিলম্ব না করে সোজা ঢাকায়, অতঃপর শেরাটনে। সাক্ষাৎ ধবল প্রস্তর মূর্তির ন্যায় সৌম্যদর্শন (কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ ছিলেন) ড. দানী আমার স্যারের নাম শুনে আমাকে অভিবাদন জানালেন। কুশলাদি জানার পর, 'বাতায়ে মুঝে কিয়া কারনা'। সম্ভবতঃ চা-পানরত অবস্থায় গবেষণার বিষয় শুনে খুশি হলেন এবং আনুপূর্বিক জ্ঞাতব্য বিষয় অবহিত করলেন।

ঢাকা থেকে ফিরেছি। কাজ শেষের দিকে। একদিন বললেন, 'তুমি মমতাজুর রহমান তরফাদারের সাহেবের কথা বলো'। স্যার Husainshahi Bengal-এর উপর পি-এইচ ডি করেছেন। স্যার আমাকে যথেষ্ট পরামর্শ দিয়েছেন। করেছেন সহযোগিতা। জেনে আমার মনটা ভরে গেল যে, আমার স্যার ড. মমতাজুর রহমান স্যারের ছাত্র ছিলেন। আর ড. রহমান স্যার হলেন ড. গোলাম রসুল স্যারের ছাত্র। ভেবে আনন্দে শিহরিত হলাম যে, একই ধারায় চার প্রজন্মকে আমি দেখেছি। তাদের সকলের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করেছি। ড. মোখলেছুর রহমান ও এ কে এম ইয়াকুব আলী হলেন স্যারের ছাত্র। আমি উভয় স্যারের নিকট পাঠ নিয়েছি, কাজ শিখেছি।

পারিবারিক জীবনে একজন সফল বাবা ও স্বামী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ছাত্রদের প্রতি তাব দরদ ও ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। আইবিএস ফ্যামিলী স্যুটে থাকাকালীন স্যারকে আপ্যায়নের আগ্রহ পোষণ করলে কখনো না করেন নি। স্বপরিবারে স্যার আসতেন। এটি ছিল আমার জন্য শ্লাঘার বিষয়। বড়রা বুঝি এমনিটি হয়। প্রখ্যাত ভাষাবিদ মাহমুদ শাহ কোরেশী স্যার ও ফ্যামিলী স্যুটে থাকতেন। স্যারকে ও দু'একবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। সাদরে গ্রহণ করেছেন। এসেছিলেন। যৎসামান্য তামদারি সত্বেও স্যারের উপচে পড়া খুশিতে আমি মনভরে উপভোগ করেছি। সস্ত্রীক আনন্দিত হয়েছি।

একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ হিসেবে সারা ক্যাম্পাসে স্যার কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে কোনো এক কারণে ছাত্ররা নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের পশ্চিমের রাস্তায় মারমুখো হয়ে মিছিল করছে। সম্ভাব্য কোন অঘটন এড়ানোর জন্য তৎকালীন ভিসি ও প্রক্টরের সবিনয় অনুরোধ একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে নীতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। মন্ত্র মুগ্ধের মতো ছাত্ররা নিশ্চল নিশ্চুপ। সে সময় আমি আপ্লুত চিত্তে অবলোকন করেছি। একবার আমি আইবিএস দপ্তরে কথা বলছি। একজন গবেষক জিজ্ঞেস করলেন (আমার কথা) ইনি কে? সম্ভবতঃ উনি এ্যাসিসটেন্ট রেজিষ্ট্রার ছিলেন, বললেন, 'বসা দেখে বুঝছেন না, ড. এবিএম স্যারের ফেলো। বলুন তো? এমন কীভাবে বসা ছিলাম? যদ্বারা মনে হয়েছে যে, ইনি এবিএম স্যারের ফেলো। আসলে সারা দেশে, অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজেও স্যারের ডাকনাম

ছিল। স্যারের অবসর ও ইন্তেকালের এক বছর পরে অনেক ছাত্র স্যারকে ভুলে গেছেন!

সুপ্রিয় পাঠক, কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার থানার ভামতিগ্রামের এ বালক জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের সারিতে দাঁড়াবেন এটি অকল্পনীয়। সাধনা ও মেধায় অপূর্ব মিশ্রণ স্যারকে মহৎ করেছে, করেছে মহীয়ান। আমার প্রতি স্যারের স্নেহ ও ভালোবাসার আর একটি অঞ্জলী উপহার না দিলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাংলা একাডেমি থেকে ডাক পড়লো স্যারের। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে কাজ করতে হবে। স্যার ফোন দিলেন। বাংলা একাডেমিতে সভা। সভার সময় ১০টা। ১০টা পাঁচ মিনিটে পৌঁছে দেখি স্যার বসে আছেন। নিয়মানুবর্তীতার কঠিন অনুসারী ড. হোসেন জীবন সায়াহ্নেও অপরিবর্তিত ছিলেন। যথাসময়ে অনেকের সাথে লেখা প্রস্তুত করে জমা দিলাম। কিন্তু আফসোস! দেখে যেতে পারলেন না। স্যারের সরলতা ছিল অবাক করার মতো। ঢাকায় একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চাকুরীর সুবাদে প্রায়শ: স্যারের বাসায় যেতাম। কুশল বিনিময় হতো। আলাপচারিতায় মনে হতো যে খুব সংখ্যক হিতৈষী ছাত্র গবেষক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন।

বার্ধক্যের সময় যে বিষয়টি মানুষকে পীড়িত করে তা হলো নিঃসঙ্গতা। শেষ পর্যায়ে ম্যাডামও কতকটা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। স্যারের শোবার ঘর উত্তরমুখী দরজা দিয়ে ড্রইং রুমে তাকালে বসে থাকা যে কোনো মানুষ চিনতে পারতেন।

একবার স্যারের সুস্থতার কথা শুনে হন্তদন্ত হয়ে বাসায় গিয়ে দেখি স্যার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে সোফায় বসে আছেন। ম্যাডামের কথা বলতেই ইশারা দিয়ে পূর্বে তাকাতে বললেন, দেখি ম্যাডাম বসা। অসুস্থতার চরম মুহূর্তেও পরস্পরের দিকে পলকহীন নেত্রে চেয়ে থাকতেন। ভার্যাপ্রীতির অনুপম নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলাম। ম্যাডামের প্রতি স্যারের অসীম ভালোবাসা আজও আমাকে আলোড়িত করে। ক্যাম্পাসে প্রয়োজন স্যারকে জিজ্ঞেস করতাম, স্যার ম্যাডাম কোথায়? তিনি অবলীলাক্রমে বলতেন লাইব্রেরী বিল্ডিং এর তিন তলার অমুক রুমে দেখো, বক্তৃতা করছেন। ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করলেও তিনিও সেরকমটি জবাব দিতেন। পরস্পরের প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অমৃত যেন উপচে পড়ছিল।

অনেক আগের কথা। সন তারিখ মনে নেই। ম্যাডাম একবার কী জানি এক সম্মেলনে গ্রীস যাবেন। স্যারকে কীভাবে নেয়া যায়, উপায় খুঁজে বের করলেন। স্যার সাথে গেলেন। স্যার সেখানে গিয়ে উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলো দেখলেন, তার মধ্যে জাদুঘর ছিল অন্যতম। এ যেন ভাস্কর্যের দেশ। ভাস্কর্যের জাদুঘর। ইতিহাস ঐতিহ্যকে পরম যতনে ধরে রাখা গ্রীকদের স্বভাব –এ উপলব্ধি স্যারকে উজ্জীবিত করেছিল। তাঁর অর্জিত জ্ঞানের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশও বঞ্চিত হয়নি।

পড়াশোনার ব্যাপারে স্যার ছিলেন আপোষহীন। জ্ঞান কোষে নতুন নতুন সংযোজন ছিল যেন আনন্দখেলা। প্রচুর তৃপ্ত হতেন। আমার গবেষণা কর্মের ইভ্যালুয়েটার ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী। স্যার একবার ইভ্যালুয়েশন সভায় বলে ফেললেন– ১০টি কেন? আপনার যে কাজের ব্যাপ্তি- ৫টি অধ্যায়ে তো অনায়াসে ডিগ্রী করতে পারতেন। সহাস্যবদনে স্যার বললেন, করুক। প্রাত্যহিক জীবনের কোনো ক্ষেত্র যেন বাদ না থাকে। আংশিক কাজ, ডিগ্রীর জন্য যতটুকু না করলেই নয় –এমন কাজ স্যারের বড়ই অপছন্দের ছিল। শুনছি, এখন নাকি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের ছাত্ররা ডিগ্রী করছে গ্রামীণ ব্যাংক ও সেচ পাম্প ইত্যাদির বিষয় নিয়ে। স্যার, যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে অন্ততঃ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এমনটি হতে দিতেন না।

স্যার, উচ্চাভিলাষী মানুষ ছিলেন, তাও কিন্তু শুধু শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষার উন্নতি নিয়ে। পেশা নিয়ে। স্যারের ধারণা ছিল, 'পেশাই আমার সঠিক পথ'। 'যদি পেশায় কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পারি, তাহলে সেটাই হবে রাষ্ট্রের প্রতি আমার সর্বোত্তম অবদান'। স্যার, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মজুরী কমিশনে হেকেপের আওতায় (Higher Secondary Quality Enhancem ent Project) বিভাগের উন্নয়নের জন্য বড় অবদান রেখেছেন। যেটি এবিএম হোসেন ছাড়া হতো না।

আমার লেখা শেষের দিকে। স্যারের ফুরফুরে মেজাজ। স্যার একদিন বললেন, তোমার গবেষণা অভিসন্দভের পরীক্ষক হিসেবে কোলকাতার বাগেশ্বরী প্রফেসর ঠিক করেছি। যাকে তাকে দিয়ে যেনতেন প্রকার কাজ তাঁর পছন্দের ছিল না। নিরবচ্ছিন্ন শ্রম সাধনা সৃজনশীলতা

সৃষ্টির পূর্বশর্ত। ড. হোসেনের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই নিহিত। সোয়াসের হিস্টরি অব ইন্ডিয়ার জনৈক রিডার স্যারের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, Whatever he wrote was carefully prepared, closely argued...। K. A Ballhatchet, Bernard Lewis David Talbot Rice K de B. Cordination প্রমুখ খ্যাতিম্যান প্রফেসরদের স্যার চিনতেন। তাঁরাও তাঁকে জানতেন এখনজন তুখোড় ছাত্র হিসেবে। আমাদের সৌভাগ্য, আমরাও স্যারের মতো মহান শিক্ষকের ছাত্র হবার সুযোগ পেয়েছি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটিই চোখে পড়ে; যারা বিদগ্ধ পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনেই বড়ই সরল। অত্যন্ত মেধাবী গবেষক ও কৃৎবিদ্য পণ্ডিত হিসেবে আমার স্যারের মাঝে আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। মনুষ্য সমাজে বৈষয়িক লেনদেনের হিসেবটা বড়ই জটিল। কিন্তু স্যার ছিলেন তার বিপরীত। এমনি ধরনের একটা ঘটনার সাক্ষী আমি নিজে। স্যারের জীবনের সায়াহ্নে তার সুলিখিত 'পড়ন্ত বেলার গল্প' একটা অসাধারণ সাহিত্যকর্ম। লেখাতে তার বর্ণাঢ্য জীবনের নানা ঘটনার রসঘন উপস্থাপনা আমাদের চমৎকৃত করে। বইটি প্রকাশের জন্য 'অ্যা' আদ্যাক্ষরের একটি পাবলিকেশন স্যারকে অনুরোধ জানায়। স্যার অকপটে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

দিন, তারিখ ও সময় ঠিক হলো। চুক্তিপত্রে সই হবে। স্যার যথাসময় ও ক্ষণে গিয়ে দেখেন প্রকাশক তার অফিসে উপস্থিত নেই। স্যার ফোন করলেন। অপর প্রান্ত থেকে প্রকাশক জানালেন, 'বড্ড ঝামেলায় পড়েছি'। আবার কষ্ট করে আসবেন? বরঞ্চ স্যার আপনি সই করে দিন, আমি ফিরেই সই করে আপনার কাছে কপিটি পাঠিয়ে দেব। স্যার সই করলেন। কিন্তু প্রকাশক আজও আসছেন। কী আশ্চর্য মানসিকতা! স্যার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমার কাছে বহুবার এ কথা বলেছেন, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। কেননা, স্যার তো সই করেই দিয়েছেন। প্রকাশক তো প্রমাণ হিসেবে স্যারের সম্মতিজ্ঞাপক স্বাক্ষর প্রদর্শন করছেন। সে কারণে অভিযোগ করার কিংবা কাউকে বলে নিষ্পত্তি করার সুযোগ ছিল না।

একবার গ্রামের বাড়ি ধামতিতে ম্যাডামসহ স্যার গেলে রীতিমতো হৈ রৈ কাণ্ড ঘটে যায়। শহুরে আবার বিলেতি ডিগ্রী পাস বধু! সবাই যেন হতবম্ভ। এমনটি তাদের যেন কম্পনার বিষয়বস্তু। ঘোমটা তুলে দেখা কিংবা উঁচুতে কেউ দাঁড় করিয়ে দেখা কোনটাই বাদ ছিলনা মৃদভাষীনি ঝর্ণাকে। ঐ পরিবেশে ঝর্ণা সৃষ্টি করেছিলেন জলতরঙ্গ। মোহিত হয়েছিল ধামতির মানুষ। ঝর্ণা ছিল ম্যাডামের ডাকনাম। ঝর্ণার নিঝরণী কুলকুলু রবে প্রবাহিত তরহাভিঘাতে পরিবেশকে অনিন্দ্য সুন্দর করে তুলেছিল। স্যারের আব্বা-মা বললেন, বউয়ের সাথে রসিকতা করবে না। কিন্তু কে শোনে কার কথা; ম্যাডামের মহত্বে ও সীমাহীন উদার্যের কাছে সব হার মানে। স্যার ও দারুণ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছিলেন বিলেতি পাশ নববধু ঝর্ণাকে নিয়ে।

আজ থেকে বছর বাইশেক আগে ইতিহাস বিভাগের মিলন মেলায় স্যার বক্তব্য প্রদানকালে সহাস্যবদনে অপলকনেত্রে চেয়ে আছেন আমার ম্যাডাম। হায়! আজ আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন।

স্যার কিন্তু দারুণ সংবেদনশীল ও পরার্থপর ব্যক্তি ছিলেন। ইতিপূর্বে লিখেছি যে, আই বি এস স্যুটে থাকাকালীন দাওয়াত করলে কখনো না করতেন না। একদিন সময় ঘনিয়ে আসছে, স্যার নেই। দ্রুতপানে বাসায় গেলাম, দেখি স্যার শয্যাশায়ী। গায়ে জ্বর। কপালে হাত বুলতেই বলে ফেললেন তুমি এসেছ? 'আমি জানি, তুমি আসবে'। ছাত্রের প্রতি কি ধরনের ভালোবাসা ও বিশ্বাস থাকলে এমন আন্তরিক উচ্চারণ হয়, 'তুমি এসেছ'? 'আমি জানি তুমি আসবে'।

স্যারের ও ম্যাডামের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। স্যারের সাথে মক্কায় গমন ও ইসলাম, ইহ-পরলোক নিয়ে কথা হতো। কথা হতো ম্যাডামের সাথে। ম্যাডাম বলতেন, 'আচ্ছা ওসমান গনী, মানুষের মৃত্যুর পর সে কোথায় থাকবে'? 'রূহের কী অবস্থা হবে'? এ ব্যাপারে যৎসামান্য আলোকপাত করলে মনযোগ দিয়ে শুনতেন। আল্লাহ তো তাওবাহ্কারীকে পছন্দ করে। স্যারকে আমি ঐসলামিক পরিবেশেও দেখেছি। আমরা তার ও প্রিয়ভাষীনি ম্যাডামের পক্ষ থেকে বারগাহে মাওলা প্রাণঢালা দু'আ করি হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাকারী, ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ করো, অতএব তুমি তাদের ক্ষমা করো।[৫৬] তুমি উভয়কে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করিও –আমীন। ❑

[৫৬] *আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫১৩; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৫০।*

ক্বাসাসুল হাদীস

আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র কিছু গুণাবলী

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

যখন মুসলমানদেরকে মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে চরম নির্যাতন করা হচ্ছিল, তখন আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাবশায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হলো, যখন বরকুল গামাদ নামক স্থানে পৌঁছল তখন কাররা বংশের সরদার ইবনু দাগিনার সাথে সাক্ষাৎ হলো, তখন সে জিজ্ঞেস করল, আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তুমি কোথায় যাবে?

আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমার জাতি আমাকে আমার জন্মস্থান থেকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি অন্য কোনো দেশে চলে যাচ্ছি, যেন আমি আমার রবের ‘ইবাদত করতে পারি।

ইবনু দাগিনা বলল, আবূ বাক্র! তোমার মতো লোককে না বের করা যায়, আর না সে নিজে বের হয়ে যায়। তুমি অসহায়কে আশ্রয় দিয়ে থাক, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো, অপরের দুঃখ নিজের কাঁধে উঠিয়ে নাও, মেহমানকে সম্মান করো, ঝগড়া-ঝাটিতে সত্যের সাহায্য করো। তাই আমি তোমাকে আমার নিরাপত্তায় নিয়ে নিলাম।

ফিরে চলো আর নিজের শহরে থেকে স্বীয় রবের ‘ইবাদত করো, আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইবনু দাগীনার কথায় মক্কায় ফিরে আসলো।

সন্ধ্যার সময় ইবনু দাগিনা আবূ বাক্রকে সাথে নিয়ে কুরাইশ সরদারদের নিকট গেল এবং বলল, আবূ বাক্রের মতো লোককে কখনো তাড়ানো যায় না এবং না সে নিজে ইচ্ছায় বের হতে পারে। তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে বের করে দিতে চাও, যে অসহায়কে আশ্রয় দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করে, মতবিরোধের সময় সত্যের পক্ষে থাকে?

কুরাইশরা ইবনু দাগিনার দেয়া নিরাপত্তাকে তো ফিরিয়ে দিলোই না; বরং বলল, আবূ বাক্রকে ভালোভাবে জানিয়ে দাও যে, সে যেন তার ঘরে থেকে যতটা পারে ততটা স্বীয় রবের ‘ইবাদত করে, নামায আদায় করে, কুরআন তিলাওয়াত করে, আর এর মাধ্যমে আমাদেরকে যেন কষ্ট না দেয় এবং প্রকাশ্যে যেন এ সমস্ত কাজ না করে। সে এই সমস্ত কাজ প্রকাশ্যে করলে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমাদের স্ত্রী-সন্তানরা ফেতনায় পড়ে যাবে।

ইবনু দাগিনা এই সমস্ত বিষয়সমূহ আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জানিয়ে দিলো, আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই শর্তে মক্কায় থেকে গেলেন যে, তিনি তার ঘরের মধ্যে থেকেই স্বীয় রবের ‘ইবাদত করবেন, প্রকাশ্যে নামায আদায় করবেন না, স্বীয় ঘরের বাহিরে কুরআন তিলাওয়াত করবেন না, এরপর হঠাৎ আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ঘরের আঙ্গীনায় একটি মসজিদ বানালেন, সেখানে তিনি নামায পড়লে এবং কুরআন তিলাওয়াত করলে মুশরিকদের স্ত্রী সন্তানরা একত্রিত হয়ে যেত, আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর তিলাওয়াত শুনে পেরেশান হয়ে যেত এবং বার বার তার দিকে তাকিয়ে থাকত। আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর ভয়ে অনেক কান্নাকাটি করতেন, যখন তিনি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি তার নয়নাশ্রু নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না, অবস্থা দেখে কুরাইশরা ইবনু দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে আসলো তখন কোরাইশ সরদাররা তার নিকট অভিযোগ করল যে, আমরা আবূ বাক্রের জন্য তোমার দেয়া নিরাপত্তা শুধু এ জন্য মেনে নিয়েছিলাম যে, সে তার ঘরে বসেই স্বীয় রবের ‘ইবাদত করবে, কিন্তু আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই শর্ত ভঙ্গ করেছে, তার ঘরের আঙ্গীনায় মসজিদ বানিয়েছে এবং ওখানে প্রকাশ্যে নামায আদায় করছে, কুরআন তিলাওয়াত করছে, আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের স্ত্রী সন্তানরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাই তুমি আবূ বাক্রকে নিষেধ করো, যদি সে চায় তাহলে স্বীয় ঘরে থেকে স্বীয় রবের ‘ইবাদত করুক, আর যদি সে তা না মানে এবং প্রকাশ্যে ‘ইবাদত করতে অনড় হয়, তাহলে তাকে দেয়া নিরাপত্তা ফিরিয়ে নাও। আমরা তোমার দেয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ করতে চাই না।

আবূ বাক্রের প্রকাশ্য ‘ইবাদত কোনোভাবেই আমাদের নিকট সহনীয় নয়। তাই ইবনু দাগিনা আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র নিকট আসলো এবং বলল, আবূ বাক্র আমি তোমার ব্যাপারে কোরাইশ সরদারদের সাথে যে চুক্তি করেছিলাম, তা তুমি জানো, তাই হয় তুমি ঐ শর্তের উপর অটল থাকো, অন্যথায় আমার দেয়া নিরাপত্তা আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমি চাই না যে, আরবদের নিকট থেকে এই কথা শুনি, আমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছি সে তা ভঙ্গ করেছে।

আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বলল, আমি তোমার দেয়া নিরাপত্তা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং মহান আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।[৫৭]

আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন নির্মল, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ চরিত্রের মানুষ। কুরআনের নৈতিক শিক্ষা ও নবী (ﷺ)-এর সাহচর্য তার চরিত্রকে আরও মার্জিত, উন্নত ও মাধুর্যপূর্ণ করেছিল। সেই যুগে আরবের সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য ছিলেন। বিদ্যাবত্তা, পবিত্র স্বভাব ও নম্র প্রকৃতির জন্য আরবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি লাভ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর কুরআন ও হাদীসে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইসলামের মর্মবাণী ও নবী (ﷺ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে নৈতিক বল ও অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, ইসলামের ইতিহাসে তা অনন্য। *[এ হাদীসটি ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, যা ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহুল বুখারীতে বর্ণনা করেছেন।]*

★ *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৫৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৯০৫।*

বিশেষ মাসায়িল

মৃত মা-বাবার জন্য সন্তানদের করণীয় কী

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে মৃত মা-বাবা জন্য কী ধরনের 'আমল করা যাবে, যে 'আমলের সওয়াব তাদের নিকট পৌঁছবে, সে সম্বন্ধে নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

১. বেশি বেশি দু'আ করা : মা-বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সন্তান মা-বাবার জন্য বেশি বেশি দু'আ করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কী দু'আ করব তাও শিক্ষা দিয়েছেন। আল-কুরআনে এসেছে–

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا﴾

"হে আমার রব! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"[৫৮]

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

"হে আমাদের রব! রোজ কিয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিনকে ক্ষমা করে দিন।"[৫৯]

এছাড়া আল্লাহ রাববুল 'আলামীন পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার বিশেষ নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন :

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

"হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মু'মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন।"[৬০]

মা-বাবা এমন সন্তান রেখে যাবেন যারা তাদের জন্য দু'আ করবে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ".

মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় 'আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩টি 'আমল বন্ধ হয় না– ১. সাদাক্বায়ে জারিয়া, ২. এমন জ্ঞান-যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, ৩. এমন নেক সন্তান– যে তার জন্য দু'আ করে।[৬১]

মূলতঃ জানাযার নামায প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আস্বরূপ।

২. দান-সাদাক্বাহ্ করা : বিশেষ করে সাদাক্বায়ে জারিয়াহ প্রদান করা। মা-বাবা বেঁচে থাকতে দান-সাদাক্বাহ্ করে যেতে পারেননি বা বেঁচে থাকলে আরো দান-সাদাক্বাহ্ করতেন, সেজন্য তাদের পক্ষ থেকে সন্তান দান-সাদাক্বাহ্ করতে পারে। হাদীসে এসেছে– "জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেছেন। তাই কোনো ওসীয়ত করতে পারেননি। আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে দান-সাদাক্বাহ্ করতেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে সাদাক্বাহ্ করলে তিনি কি এর সাওয়াব পাবেন? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই পাবেন।"[৬২]

তবে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সাদাক্বায়ে জারিয়া বা প্রবাহমান ও চলমান সাদাক্বাহ্ প্রদান করা। যেমন- পানির কূপ খনন করা, নলকূপ বসানো, দ্বীনী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তব ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, স্থায়ী জনকল্যাণমূলক কাজ করা ইত্যাদি।

৩. মা-বাবার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন : মা-বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি তাদের কোনো মানতের সিয়াম কাযা থাকে, সন্তান তাদের পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করলে তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমতাবস্থায় যে তার উপর রোযা ওয়াজিব ছিল। তবে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিসগণ রোযা রাখবে।"[৬৩]

অধিকাংশ 'আলেম এ হাদীসটি শুধুমাত্র ওয়াজিব রোযা বা মানতের রোযার বিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাদের পক্ষ থেকে নফল সিয়াম রাখার পক্ষে দলিল নেই।

৪. হজ্জ বা 'উমরাহ্ করা : মা-বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ বা 'উমরাহ্ করলে তা আদায় হবে এবং তারা উপকৃত হবে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, "জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হজ্জ করার মানত

---

[৫৮] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ২৪।*
[৫৯] *সূরা ইব্‌রা-হীম : ৪১।*
[৬০] *সূরা নূহ্ : ২৮।*
[৬১] *মুসলিম- হা. ৪৩১০, মাকতাবাতুশ্ শামেলা, হা. ১৪/১৬৩১।*
[৬২] *মুসলিম- হা. ২৩৭৩, মা. শা., হা. ৫১/১০০৪, .../১০০৪।*
[৬৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫২।*

করেছিলেন কিন্তু তিনি হজ্জ সম্পাদন না করেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ করো। তোমার কি ধারণা, যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকত তবে তুমি তা পরিশোধ করতে না? সুতরাং আল্লাহর জন্য তা আদায় করো।"[৬৪]

তবে মা-বাবার পক্ষ থেকে যে হজ্জ বা 'উমরাহ্ করতে চায় তার জন্য শর্ত হলো, তাকে আগে নিজের হজ্জ-'উমরাহ্ আদায় করতে হবে।

৫. মা-বাবার ওসীয়ত পূর্ণ করা : মা-বাবা শরীয়াহসম্মত কোনো ওসীয়ত করে গেলে তা পূর্ণ করা সন্তানদের উপর দায়িত্ব। রাশীদ ইবনু সুয়াইদ আস্ সাকাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা একজন দাসমুক্ত করার ওসীয়ত করে গেছেন। আর আমার নিকট কালো একজন দাসী আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : তাকে ডাকো, সে আসলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার রব কে? উত্তরে সে বলল, আমার রব আল্লাহ। আবার প্রশ্ন করলেন আমি কে? উত্তরে সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও; কেন না সে মু'মিনা।[৬৫]

৬. মা-বাবার বন্ধুদের সম্মান করা : মা-বাবার বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, সম্মান করা, তাদেরকে দেখতে যাওয়া, তাদেরকে হাদীয়া দেয়া। এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ আছে, একদা মাক্কার পথে চলার সময় 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এক বেদুঈন এর সাথে দেখা হলে তিনি তাকে সালাম দিলেন এবং তাকে সে গাধায় চড়ালেন যে গাধায় 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর ('আব্দুল্লাহ) মাথায় যে পাগড়িটি পরা ছিল তা তাকে প্রদান করলেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, তখন আমরা 'আব্দুল্লাহকে বললাম : আল্লাহ তা'আলা তোমার মঙ্গল করুক! এরা গ্রাম্য মানুষ : সামান্য কিছু পেলেই এরা সন্তুষ্ট হয়ে যায়– (এতসব করার কি প্রয়োজন ছিল?) উত্তরে 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তার পিতা, (আমার পিতা) 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– "পুত্রের জন্য পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভালো ব্যবহার করা সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ।[৬৬]

৭. মা-বাবার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা : সন্তান তার মা-বাবার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। হাদীসে এসেছে,

'যে ব্যক্তি তার পিতার সাথে কবরে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ভালোবাসে, সে যেন পিতার মৃত্যুর পর তার ভাইদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখে।'[৬৭]

৮. ঋণ পরিশোধ করা : মা-বাবার কোনো ঋণ থাকলে তা দ্রুত পরিশোধ করা সন্তানদের উপর বিশেষভাবে কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঋণের পরিশোধ করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

"মু'মিন ব্যক্তির আত্মা তার ঋণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যায়; যতক্ষণ তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়।"[৬৮]

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে,

যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার ঋণ পরিশোধ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৬৯]

৯. কাফফারা আদায় করা : মা-বাবার কোনো শপথের কাফফারা, ভুলকৃত হত্যাসহ কোনো কাফফারা বাকী থাকলে সন্তান তা পূরণ করবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾

"যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোনো মু'মিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মু'মিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সাদাক্বাহ্ (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে সেটা ভিন্ন কথা)।"[৭০]

হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ».

"যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করলো। অতঃপর দেখলো সেটি হতে অন্যটি উত্তম, তাহলে সে যেন উত্তমটিই করে এবং তার (পূর্বের) শপথের কাফ্ফারাহ দিয়ে দেয়।"[৭১]

---

[৬৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৫২।*
[৬৫] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ১৮৯।*
[৬৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৬৭৭, মা. শা., হা. ১১/২৫৫২।*
[৬৭] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৪৩২।*
[৬৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৪১৩, সহীহ।*
[৬৯] *সুনান আন্ নাসায়ী- ৭/৩১৪, হা. ৪৬৮৪; তাবরানী ফিল কাবীর- ১৯/২৪৮; মুস্তাদরাকে হাকিম- ২/২৯।*
[৭০] *সূরা আন্ নিসা : ৯২।*
[৭১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৩৬০, মা. শা., হা. ১১/১৬৫০।*

এ বিধান জীবিত ও মৃত সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। দুনিয়ার বুকে কেউ অন্যায় করলে তার কাফফারা দিতে হবে। অনুরূপভাবে কেউ অন্যায় করে মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফফারা প্রদান করবেন।

১০. ক্ষমা প্রার্থনা করা : মা-বাবার জন্য মহান আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা। সন্তান মা-বাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। মৃত্যুর পর যখন কোনো বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় তখন সে বলে, হে আমার রব! আমি তো এতো মর্যাদার 'আমল করিনি, কীভাবে এ 'আমল আসলো? তখন বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় তুমি এ মর্যাদা পেয়েছ।"[৭২]

১১. মান্নত পূরণ করা : মা-বাবা কোনো মান্নত করে গেলে সন্তান তার পক্ষ থেকে পূরণ করবে। হাদীসে এসেছে,
কোনো এক মহিলা রোযা রাখার মান্নত করেছিল, কিন্তু সে তা পূরণ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল। এরপর তার ভাই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করো।[৭৩]

১২. মা-বাবার ভালো কাজসমূহ জারি রাখা : মা-বাবা যেসব ভালো কাজ করে গিয়েছেন সন্তান হিসাবে তা যাতে অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থা করা। কেননা এসব ভালো কাজের সওয়াব তাদের 'আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে। হাদীসে এসেছে– "ভালো কাজের পথপ্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে।"[৭৪]

১৩. ক্ববর যিয়ারত করা : সন্তান তার মা-বাবার কবর যিয়ারত করবে। এর মাধ্যমে সন্তান এবং মা-বাবা উভয়ই উপকৃত হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা কবর যিয়রাত করো, কেননা তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৭৫] তবে ক্ববর যিয়ারতের জন্য কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করে করা যাবে না।

১৪. ওয়াদা করে গেলে তা বাস্তবায়ন করা : মা-বাবা কারো সাথে কোনো ভালো কাজের ওয়াদা করে গেলে বা এমন ওয়াদা যা তারা বেঁচে থাকলে করে যেতেন, সন্তান যথাসম্ভব তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

"আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৭৬] তবে ওসীয়ত করে গেলে এবং সে পরিমাণ মাল থাকলে সম্পদ বন্টনের পূর্বে তা আদায় করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

"তবে সে যা নির্দেশ করে গেছে, সেই নির্দেশ ও ঋণ অন্তে।"[৭৭]

﴿بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

"তবে কৃত অসীয়ত পূরণ করার পর অথবা ঋণের পর কারো অনিষ্ট না করে।"[৭৮]

১৫. কোনো গুনাহের কাজ করে গেলে তা বন্ধ করা : মা-বাবা বেঁচে থাকতে কোনো গুনাহের কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তা বন্ধ করবে বা শরীয়াহসম্মতভাবে সংশোধন করে দিবে। হাদীসে এসেছে, "এবং যে মানুষকে গুনাহের দিকে আহ্বান করবে, এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ গুনাহ তার 'আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। অথচ তাদের গুনাহ থেকে কোনো কমতি হবে না।"[৭৯]

১৬. মা-বাবার পক্ষ থেকে মাফ চাওয়া : মা-বাবা বেঁচে থাকতে কারো সাথে খারাপ আচরণ করে থাকলে বা কারো উপর যুল্ম করে থাকলে বা কাওকে কষ্ট দিয়ে থাকলে মা-বাবার পক্ষ থেকে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিবে অথবা ক্ষতি পূরণ দিয়ে দিবে। কেননা হাদীসে এসেছে– "তোমরা কি জানো নিঃস্ব ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নেই সে হলো গরীব লোক। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো গরীব, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে লোকের মাল খেয়েছে, সে লোকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে সেদিন তার নেক 'আমলনামা দিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৮০]
সুতরাং এ ধরনের নিঃস্ব ব্যক্তিকে মুক্ত করার জন্য তার হক্বদারদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া সন্তানের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মা বাবার জন্য 'আমলগুলো করার তাওফীক্ব দিন –আমীন। ❑

---

[৭২] *আল-আদাবুল মুফরাদ- হা. ৩৬।*
[৭৩] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ২৮০।*
[৭৪] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৭১।*
[৭৫] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১০৫৪।*
[৭৬] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৩৪।*
[৭৭] *সূরা আন্ নিসা : ১১।*
[৭৮] *সূরা আন্ নিসা : ১২।*
[৭৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৯৮০, মা. শা., হা. ১৬/২৬৭৪।*
[৮০] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৪২৮, হাসান সহীহ।*

সমাজচিন্তা

ওয়াজের ময়দানের বক্তা ও প্রকৃত আলেম

মূল : ঈসা আল-কাদূমী
অনুবাদ : আসিফ রেজা*

বাস্তবেই আমরা এমন একটা সময়ে বসবাস করছি, যখন বক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আলেমদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে সত্যবাদী বিশ্বস্ত মুহাম্মাদ (ﷺ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন, এটা তারই বাস্তবতা। কারণ বর্তমান যুগে 'আলেম কম ও বক্তা বেশি। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে ঢু মারলেই আপনি অনায়াসে বক্তাদের আধিক্য এবং আল্লাহওয়ালা মুত্তাক্বী 'আলেমদের স্বল্পতার প্রমাণ পাবেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِيْ زَمَانٍ كَثِيْرٌ عُلَمَاؤُهُ قَلِيْلٌ خُطَبَاؤُهُ، مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ هَوَى، وَيَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ زَمَانٌ كَثِيْرٌ خُطَبَاؤُهُ، قَلِيْلٌ عُلَمَاؤُهُ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِعُشْرِ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ نَجَا.

'তোমরা বর্তমানে এমন একটা যুগে আছ, যখন 'আলেমদের সংখ্যা বেশি এবং বক্তাদের সংখ্যা কম। এক্ষণে যে ব্যক্তি তার জানা বিষয়ের এক দশমাংশ ত্যাগ করবে, সে ধ্বংস হবে। এরপর এমন একটা যুগ আসবে যখন বক্তাদের সংখ্যা বেশি হবে এবং 'আলেমদের সংখ্যা কমে যাবে। তখন যে ব্যক্তি তার জানা বিষয়ের এক দশমাংশ আঁকড়ে ধরবে সে নাজাত পাবে।'[৮১]

হাদীসটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগ থেকে মন্দ হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের যুগে মুসলিম উম্মাহর মাঝে অনেক 'আলেম ছিলেন। যখন 'আলেমদের সংখ্যা বেশি হয়, তখন বক্তাদের সংখ্যা কমে যায়। কারণ 'আলেমরা হলেন জাতির মাঝে কল্যাণ, নিরাপত্তা ও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রতীক। আর যে যুগে 'আলেমদের সংখ্যা বেশি হয়, তাতে কল্যাণ বেড়ে যায়, অকল্যাণ হ্রাস পায় এবং ফিতনা-ফাসাদের কবর রচিত হয়।

নবুওয়াতের যুগ যেখানে সাহাবীগণ সঠিক পথের দিশারী রাসূল (ﷺ)-এর সামনে ছিলেন, সেটা ছিল মানুষের হৃদয়ে দ্বীন প্রোথিত হওয়ার, পৃথিবীতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং ইসলাম প্রসার লাভের যুগ। সুতরাং নিকটবর্তী বা দূরবর্তী শত্রুর আশঙ্কা ব্যতীত দ্বীনের প্রতিটি বিধানকে যে আঁকড়ে ধরবে না, তার কোনো অজুহাত থাকবে না। আর যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের কোনো একটি ওয়াজিব ত্যাগ করল, সে গুনাহগার হলো। নবী করীম (ﷺ) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, তারা এমন একটি যুগে বাস করছে, যেটি শান্তি, নিরাপত্তা ও ইসলামের মর্যাদার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং মহান আল্লাহর দ্বীনের নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশ ত্যাগ করল, সে ধ্বংসে নিপতিত হলো। কারণ ত্যাগ করাটাই অপরাধ এবং এর কোনো ওযর নেই।

এরপর এমন এক যুগ আসে, যখন ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়ে, অত্যাচার-অনাচার ও পাপাচার বেড়ে যায়, ইসলামের সাহায্যকারীদের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় উম্মাতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওয়াসীয়ত ছিল, দ্বীনের অধিকাংশ বিধি-বিধানের প্রতি 'আমল করা কষ্টসাধ্য হওয়ার কারণে জানা বিষয়সমূহের এক দশমাংশ আঁকড়ে ধরা। কারণ উম্মাতের অবস্থা ও তাকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি পাত্রের এক লোকমা খাবারের মতো। এমতাবস্থায় কল্যাণকর কাজসমূহকে অকল্যাণকর কাজের উপর প্রাধান্য দেয়াই এ জাতির স্থিতিশীলতা ও

* *ছাত্র- মাদীনাহ্ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।*

[৮১] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২২৬৭, অধ্যায় : 'ফিতান', অনুচ্ছেদ- ৭৮; মুসনাদ আহমাদ- হা. ২১৪০৯; সিলসিলা সহীহাহ্- হা. ২৫১০।*

ভারসাম্য আনয়ন করবে। সংস্কারের চেয়ে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক খতীব ও বক্তা মিম্বরে বা মঞ্চে উঠে ইচ্ছামত ‘ইল্মহীন কথাবার্তা বলবে, সেটা নয়।

‘ইল্ম ও ‘আলেমদের সংখ্যা কম হলে বড় বড় বুলি আওড়ানো বিভ্রান্তকারী বক্তারা তাদের ভ্রষ্টতার বিষ ছড়ানোর সুযোগ পায়। আর এমন সব বিষয়ে লেখনী ও বই-পুস্তক বৃদ্ধি পায়, যা দেখলে দুর্ভাবনায় কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। সেসব লেখনীতে ইসলামের বিধি-বিধান ও দণ্ডবিধিসমূহ বিনষ্ট হয় এবং তার সাথে মানুষের প্রবৃত্তি ও তাদের ফিতনাহ অনুপাতে মনগড়া বিভিন্ন মতবাদ, বিদআত ও ভ্রষ্টতা বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

শেষ যামানায় ‘আলেমদের সংখ্যা কমে যাবে, মূর্খতা বেড়ে যাবে এবং ফিতনা-ফাসাদ ব্যাপকতা লাভ করবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) সংবাদ দিয়েছেন যে, যখন ‘আলেমদের মৃত্যু হবে, তখন ‘ইল্ম উঠে যাবে এবং মূর্খতা ধেয়ে আসবে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

‘কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হলো– (১) ‘ইল্ম উঠিয়ে নেয়া হবে, (২) মূর্খতা বেড়ে যাবে, (৩) মদ্যপান করা হবে এবং (৪) ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।’[৮২]

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

‘নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ‘ইল্ম তুলে নিবেন না; বরং ‘আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ‘ইল্ম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন একজন ‘আলেমকেও তিনি জীবিত রাখবেন না, তখন লোকেরা মূর্খ নেতাদের গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসিত হবে। তখন না জেনেই ফাতাওয়া দিবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।’[৮৩]

‘আলেমগণ বক্তাদের আধিক্য ও ফক্বীহগণের স্বল্পতাকে কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে গণ্য করেছেন। ইমাম মালেক ‘মুওয়াত্ত্বা’য় ইয়াহইয়া ইবনু সা‘ঈদ থেকে বর্ণনা করেন, একদা ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন,

إِنَّكَ فِيْ زَمَانٍ كَثِيْرٌ فُقَهَاؤُهُ قَلِيْلٌ قُرَّاؤُهُ تُحْفَظُ فِيْهِ حُدُوْدُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُرُوْفُهُ قَلِيْلٌ مَنْ يَسْأَلُ كَثِيْرٌ مَنْ يُعْطِيْ يُطِيْلُوْنَ فِيْهِ الصَّلَاةَ وَيَقْصُرُوْنَ الْخُطْبَةَ يُبَدُّوْنَ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ وَسَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيْلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيْرٌ قُرَّاؤُهُ تُحْفَظُ فِيْهِ حُرُوْفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُدُوْدُهُ كَثِيْرٌ مَنْ يَسْأَلُ قَلِيْلٌ مَنْ يُعْطِيْ يُطِيْلُوْنَ فِيْهِ الْخُطْبَةَ وَيَقْصُرُوْنَ الصَّلَاةَ يُبَدُّوْنَ فِيْهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ.

‘তুমি এখন এমন এক যুগে বাস করছ, যে যুগে ফক্বীহ তথা প্রাজ্ঞ ‘আলেমের সংখ্যা বেশি এবং ক্বারীর (সাধারণ ‘আলেমের) সংখ্যা কম। এ যুগে কুরআনের সীমারেখাসমূহ সংরক্ষণ করা হয় (অর্থাৎ- কুরআনের বিধি-নিষেধ পালন করা হয়), শব্দের দিকে মনোযোগ দেয়া হয় কম। এ যুগে প্রার্থীর সংখ্যা কম এবং দাতার সংখ্যা বেশি। এ যুগের লোকেরা সালাত দীর্ঘ করে এবং খুৎবাকে সংক্ষিপ্ত করে। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণের পূর্বেই ‘আমলের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন বিজ্ঞ ‘আলেমদের সংখ্যা কম হবে এবং ক্বারী বা সাধারণ ‘আলেমদের সংখ্যা বেশি হবে। তখন কুরআনের শব্দসমূহকে হেফাযত করা হবে (হাফেযের সংখ্যা বেড়ে যাবে) এবং কুরআনের সীমারেখাসমূহ

[৮২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৮০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৭১; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৪৩৭।*

[৮৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৭৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২০৬।*

বিনষ্ট হবে। প্রার্থী বেশি হবে এবং দাতা কম হবে। তখন লোকেরা খুৎবাহ্ দীর্ঘায়িত করবে এবং সালাত সংক্ষিপ্ত করবে। আর তারা 'আমলের পূর্বে নিজেদের খেয়ালখুশির দিকে এগিয়ে যাবে।'[৮৪]

'আলেম কারা?

যারা কথার ফুলঝুরিতে প্রতারিত হয়েছেন এবং বাগ্মিতাকে 'ইল্মের মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করেছেন, তাদের প্রতিবাদে হাফেয ইবনু রজব হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর মূল্যবান ও উপকারী গ্রন্থ 'ফাযলু ইলমিস সালাফ 'আলা ইলমিল খালাফ'-এ বলেছেন, 'আমরা কিছু মূর্খ লোকদের মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়েছি। পরবর্তী 'আলেমদের মধ্যে যারা বেশি কথা বলেছেন, তাদের কারো কারো ব্যাপারে তারা ধারণা করে যে, তিনি পূর্ববর্তীদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো ব্যক্তির বক্তব্য ও লেখনী বেশি হওয়ার কারণে তার সম্পর্কে ধারণা করে যে, তিনি তার পূর্বের সাহাবী ও তাবে'ঈদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলে যে, তিনি অনুসরণীয় প্রসিদ্ধ ফক্বীহগণের চেয়ে বেশি জ্ঞানী। অতঃপর ইবনু রজব (রহিমাহুল্লাহ) সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, লায়েস ও ইবনুল মুবারক প্রমুখের নাম উল্লেখ করে বলেন,

فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم.

'এ সকল বিদ্বান পরবর্তীদের তুলনায় স্বল্পভাষী ছিলেন।'

এমন ধারণা সালাফে সালেহীনকে দারুণভাবে খাটো করা, তাদের সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করা এবং তাদেরকে অজ্ঞতা ও জ্ঞানের স্বল্পতার প্রতি সম্বন্ধ করার নামান্তর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

হাফেয ইবনু রজব আরো উল্লেখ করেছেন যে, 'মোটকথা, এই ফিৎনা-ফাসাদের যুগে ব্যক্তিকে হয় মহান আল্লাহর নিকটে 'আলেম হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে অথবা জনগণের নিকটে 'আলেম হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যদি সে প্রথমটিতে সন্তুষ্ট হয় তাহলে তার ব্যাপারে মহান আল্লাহর অবগতিকেই যেন সে যথেষ্ট মনে করে। আর যার সাথে মহান আল্লাহর পরিচয় ঘটে, সে এই পরিচয়কেই যথেষ্ট মনে করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের নিকটে 'আলেম বিবেচিত না হলে সন্তুষ্ট হয় না, সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেখানে তিনি বলেছেন :

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

'যে ব্যক্তি মূর্খদের সাথে তর্ক করার জন্য অথবা 'আলেমদের সাথে গর্ব করার জন্য অথবা তার দিকে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৮৫]

নিঃসন্দেহে এই যুগে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা, তার হেফাযত করা এবং দ্বীন থেকে দূরে সরে না যাওয়া। কাজেই অল্প হলেও নিয়মিত ভালো কাজ করার মধ্যে মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তা এবং পদস্খলন থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ সাধ্যানুযায়ী এ বিষয়টাকে আঁকড়ে ধরা যে,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

"আল্লাহ কারু উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না।"[৮৬]

এইভাবে দ্বীন আঁকড়ে ধরাকে সে তার জীবন ধারা হিসাবে বেছে নিবে, যার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি তার দ্বীন ও 'আক্বীদাকে হিফাযত করবে।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান অর্জনের তাওফীক্ব দেন এবং আমরা তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এমন জ্ঞান থেকে যা উপকার দেয় না, এমন অন্তর থেকে যা ভীত হয় না, এমন অন্তর থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ থেকে যা কবুল করা হয় না। যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। *[মাসিক 'সাওতুল উম্মাহ', জামি'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, জুন ২০১৫, পৃ. ২৪-২৬, গৃহীত : মাজাল্লাহ আল-ফুরক্বান, কুয়েত থেকে অনূদিত]*

---

[৮৪] *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক- হা. ৫৯৭; সহীহাহ্- হা. ৩১৮৯।*

[৮৫] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৫৩, ২৬০; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২২৫-২৬; সহীহুল জামে'- হা. ৬১৫৮।*

[৮৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬।*

ইতিহাস-ঐতিহ্য

সাহাবিদের ‘আমলে নির্মিত লালমনিরহাটের হারানো মসজিদ

(নির্মিত : ৬৯ হি., ৬৯০ ইং; পুনরুদ্ধার : ১৪০৬ হি., ১৯৮৫ ইং)

–মো. কায়ছার আলী*

হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিদর্শনে সমৃদ্ধ আমাদের বাংলাদেশ। বাংলার প্রায় প্রতিটি জনপদে রয়েছে আবহমানকালের সাক্ষী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। প্রত্ন মানে পুরাতন বা প্রাচীন। তত্ত্ব মানে বিমূর্ত, অনুমান, ধারণা, অনুমিত, কল্পনা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত জিনিসপত্র, মুদ্রা, অট্টালিকা, স্থাপত্য, গয়না, ধাতব অস্ত্র ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্নে ইতিহাসের শেকড় প্রোথিত আছে নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর, মুন্সীগঞ্জের নাটেশ্বর, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর সোমপুর বিহার, কুমিল্লার ময়নামতি, পঞ্চগড়ের ভেতরগড়ে। এর সাথে যোগ হয়েছে উত্তরবঙ্গে লালমনিরহাট জেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস গ্রামে তিস্তা নদীর পাড়ের একটি প্রাচীন মসজিদ। মসজিদ মহান আল্লাহর ঘর। দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র স্থান। এক ইমামের নেতৃত্বে মুসলমানেরা সেখানে শ্রদ্ধাভরে, বিনয়ের সাথে স্বেচ্ছায় মাথানত বা সিজদাহ্ করে। মসজিদ নির্মাণ ও খেদমতে আত্মনিয়োগ করা অনেক সম্মানজনক ও পুণ্যের কাজ এবং নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত ঈমানের পরিচায়ক। স্থায়ীভাবে সালাত আদায়ের জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হয়, সেটাই মসজিদ। মানুষের স্বভাবধর্ম নতুন কোনো কিছু আবিষ্কার করা। হোক সেটা তথ্য ও প্রযুক্তি, বিজ্ঞান বা প্রাচীন নিদর্শন। আবিষ্কারের মাধ্যমে কিছু মানুষ তাঁদের নাম ইতিহাসের সোনালি পাতায় লিপিবদ্ধ করেন। সভ্যতার আদি নিদর্শন নদ-নদী। নদ-নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে প্রাচীন সভ্যতা, শহর নগর বন্দর ও মানববসতি। তিস্তা নদীর উর্বর পলি দিয়ে গঠিত বৃহত্তর রংপুর জেলা। রংপুর ও কুড়িগ্রাম মহাসড়কে পাশে রামদাস গ্রামের পূর্বপুরুষেরা এই অঞ্চলে প্রায় ২০০ বছর আগে আগমন করেন। অতীতে এই গ্রামটির বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল ‘মজদের আড়া’। আড়া মানে জংগল বা জংগলময় স্থান। যেখানে ছিল হিংস্রপ্রাণীদের নিরাপদ বসবাস। ভয়ে কেউ দিনের বেলাতেও ভিতরে প্রবেশ করত না। এ অঞ্চলকে ঘিরে নানারকম রূপকথা প্রচলিত ছিল। একদিকে তিস্তা, অন্যদিকে বিশাল জংগল। এই মজদের আড়ার পূর্ব মালিক ছিলেন পঁচা দালাল। ইয়াকুব আলী নামে এক ব্যক্তি সেটা কিনে নেন। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই জমির মালিক হন নবাব আলী। ১৯৮৩-৮৪ সালের দিকে স্থানীয় জনগণ কৃষি কাজ তথা চাষাবাদের জন্য জায়গাটি পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেয়। জায়গাটি পরিষ্কার করে সমতল করার সময়, তারা দেখতে পায় ৭/৮টি মাটির উঁচু টিলা। তারা ভাবলেন হতে পারে সেগুলো কোনো অতীতকালের রাজা বাদশাহ বা জমিদারের বাড়ি। একটি টিলা বা ঘর উত্তর দক্ষিণে ২১ ফুট লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে ১০ ফুট চওড়া। ৪টি স্তম্ভের মধ্যের ২টি স্তম্ভ ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রাচীনকালের প্রচুর ইট, পোড়ামাটি এবং সেই ইটের গায়ে অংকিত কিছু নান্দনিক ফুলের চিহ্ন। সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে আইয়ুব আলী পুরোনো ইটের মধ্যে একটি শিলালিপি (৬” দৈর্ঘ্য, ৬” প্রস্থ ও ২” মোটা) খুঁজে পান। পরবর্তীতে শিলালিপিটি ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেখতে পান সেখানে আরবিতে লেখা আছে কালেমাহ্ “লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” এবং হিজরি সন ৮ই মুহার্‌রম ৬৯। বর্তমানে শিলালিপিটি তাজহাট জমিদারবাড়ি রংপুর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। মসজিদের দেওয়ালে শিলালিপিটির ছবি এবং পুরোনো ইটের স্তূপ সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে। মূল মসজিদের প্রাচীরের দেওয়ালটির অংশ নতুন মসজিদের ভিতরে শক্ত মোটা কাঁচ দিয়ে কালের জীবন্ত সাক্ষী হিসাবে আমাদের এখনও অনুপ্রেরণা, শক্তি ও সাহস জোগায়। শিলালিপিটি পেয়েই সবার টনক নড়েচড়ে

* *লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

উঠে। চারিদিকে হৈচৈ পড়ে যায়, শুরু হয় গবেষণা। শতাধিক গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ ও ইতিহাসবিদের চেষ্টায় এবং আন্তর্জাতিক মানের বিশেষ করে আমেরিকার ও ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান সবকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত হয়ে একমত পোষণ করে ঘোষণা দেয় যে, এই মসজিদটি ৬৯ হিজরিতে নির্মিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে রংপুর টাউন হলে একটা সেমিনারের আয়োজন করা হয়, যার বিষয়বস্তু ছিল "হিজরি প্রথম শতাব্দীতে ইসলাম ও বাংলাদেশ" সব আলোচক ও প্রবন্ধকার এই মসজিদকে ৬৯ হিজরি এবং সাহাবায়ে কিরামগণ কর্তৃক এই হারানো মসজিদ নির্মাণ করা মোটেই অসম্ভব নয় বলে মতামত দেন। ১৩৭২ বছর পর হারিয়ে যাওয়া মসজিদ ১৯৮৫ সালে পুনরুদ্ধার হওয়ায় মসজিদটির নাম রাখা হয় হারানো মসজিদ বা সাহাবায়ে কিরাম মসজিদ। মসজিদের সঙ্গে একটি নূরানী হাফেজিয়া ও কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। মসজিদের আবিষ্কার বিস্ময়কর বটে। এদেশের উত্তরাঞ্চলের ইতিহাসের সাথে বিশ্বসভ্যতার সম্পর্কের আরেক ইতিহাস জানার পথ খুলে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব থেকে রোমান, চৈনিক, আরব ও বাংলা এই চার অঞ্চলে প্রাচীন যুগে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় আরব বণিকেরা সিকিম ও চীনের ভিতর দিয়ে নৌপথের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহরের যাতায়াত ছিল। তাদের মতে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন বাণিজ্যের নৌরুট। চীনে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে পাওয়া যায়, সাহাবিদের যুগে চারজনের নেতৃত্বে ছিলেন সাহাবী আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। অপর তিনজন ছিলেন কায়েস ইবনু হুজায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ওরায়াহ ইবনু আসাসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবূ কায়েস ইবনুল হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আমীর আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চীনের কোয়াংটা নদীর তীরে নির্মিত একটি মসজিদ এবং অদূরেই তাঁর সমাধি প্রায় চৌদ্দশত বছর ধরে চীনা মুসলমানদের কাছে পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য। অন্য দু'জন সাহাবি উপকূলীয় ফু-কান প্রদেশের চুয়ান-চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত রয়েছেন। চীনের কোয়াংটা মসজিদ এবং লালমনিরহাটের হারানো মসজিদের নির্মাণশৈলী একই ধরনের। তাই ধরে নেওয়া হয় যে তিনি এবং তাঁর সাথিরা বাংলাদেশে হারানো মসজিদ নির্মাণ করার পর চীনে গমন করেছিলেন। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (ﷺ) ১০ হিজরিতে আরাফাতের ময়দানে সোয়া লক্ষ সাহাবির সামনে বিদায় হজ্জের ভাষণ বা খুৎবাহ্ দেন। মাত্র দশ হাজার সাহাবির কবর মক্কা-মদিনায় আছে। লক্ষাধিক সাহাবি জীবন বাজি রেখে অনুপস্থিত দুনিয়াবাসীর কাছে তাঁদের মাতৃভূমি, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজনের মায়া মহব্বত উপেক্ষা করে সবকিছুই ফেলে নিজেকে 'দাঈ' ইলাল্লাহ' মনে করে পৃথিবীর চারিদিকে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে পাহাড়, পর্বত, সাগর-মহাসাগর, মরুভূমি অতিক্রম করে মহান আল্লাহর ওয়াস্তে বেরিয়ে পড়েন। আল্লাহপাক আল কুরআনের সূরা আল মুজাদালার ২২ নম্বর আয়াতে এজন্যই বলেছেন, "রাদিয়াল্লাহু 'আন্হুম ওয়া রাদি আনহু" অর্থাৎ- আল্লাহপাক তাঁদের উপর খুশি এবং তাঁরাও মহান আল্লাহর উপর খুশি, সুবহানআল্লাহ। মহান আল্লাহর মেহেরবাণীতে এবং নবী (ﷺ) প্রিয় সাহাবিদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা মক্কা-মদিনা থেকে এতদূরে বসবাস করে শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়া পেয়েছি। সাহাবীদের যুগের হারানো মসজিদ ফিরে পেয়েছি। সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক নির্মিত 'হারানো মসজিদে' আপনি/আপনারা গিয়ে কমপক্ষে দুই রাকআত নফল নামায আদায় করে একটু হলেও মানসিক তৃপ্তি পাবেন, এ ব্যাপারে আমি আশাবাদি। ইসলামের ইতিহাসের তথ্যমতে ১১/১২ শতকে সুফী সাধকদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। তবে ইসলামের বীজরোপণ হয়েছিল সাহাবিদের সোনালী যুগে ৬৯ হিজরিতে 'হারানো মসজিদ'-এর প্রতিষ্ঠাকালে, এ কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মহাকালের একমাত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। তাই সভ্যতার পালাবদলে আর কত রহস্য লুকিয়ে আছে, এই অঞ্চলে তাও একদিন হয়তো জানা যাবে। ❑

কিশোর ভুবন

আমি একটা হাতি!

মূল : আব্দুত তাওয়াব ইউসুফ

অনুবাদ : আহমাদ রফিক*

আমি একটি হাতি! সব হাতির যেমন লম্বা শুঁড় থাকে, আমারও তেমন লম্বা একটা শুঁড় রয়েছে। কিন্তু তোমরা আমাকে এখন আর বনে জঙ্গলে বা চিড়িয়াখানায় দেখতে পাবে না। কারণ আমি অনেক দিন আগের কথা বলছি। তখন আমার খুব নামডাক ছিল। আমার না খুব আশ্চর্য একটি ঘটনা আছে। আজ তোমাদেরকে সেই ঘটনাই বলবো।

আমার ঘটনার শুরু ইথিওপিয়ায়। ইথিওপিয়া আফ্রিকার একটি দেশ। আমি তখন বনের মধ্যে ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াতাম। হঠাৎ একদিন কিছু লোক আমাকে ধরে পোষ মানিয়ে ফেললো। তারা যখন দেখলো আমি খুব শক্তিশালী, তখন আমাকে সেনাবাহিনীর কাজে লাগালো। সেনাবাহিনীর সাথে আমি ইয়েমেনে চলে এলাম।

সবাই আমাকে খুব ভয় পেতো। আমার পায়ের আওয়াজ শুনলেই তারা ভয়ে কেঁপে উঠতো। কারণ আমি খুব দুষ্টু ছিলাম যে, তাই যেখানে যেতাম সেখানেই সবার ক্ষতি করতাম। কোনোকিছু আমার সামনে পড়লেই সেটাকে ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে নষ্ট করে ফেলতাম। আমাকে বকা দেয়ার সাহস কারো ছিল না। কারণ আমার মালিক ইয়েমেন দেশের রাজা ছিল।

একসময় আমার মালিক রাজা আবরাহা আমাকে তার নিজের হাতি বানিয়ে নিলেন। আমাকে তার মন্দিরের কাঠ-পাথর আনার কাজে লাগাল। ও! তোমাদেরকে তো বলাই হয়নি, রাজা আবরাহা একটি বড়ো মন্দির বানাচ্ছিলেন। এত বড়ো, যেন সেটা মক্কার কাবা শরীফকেও ছাড়িয়ে যায়। তোমরা কাবা শরীফ চেনো? সারা পৃথিবীর মানুষ কাবা শরীফ দেখতে যায়। হজ্জ করতে যায়। রাজা আবরাহা তার মন্দিরে একটি স্বর্ণের ঘর বানালেন। যেন মানুষ হজ্জ করতে মক্কায় না গিয়ে এখানেই আসে। কিন্তু মানুষ এখানে হজ্জ করতে আসলোই না! তারা দলে দলে মক্কায় গিয়ে হজ্জ করতে লাগলো।

রাজা আবরাহা তো অনেক রেগে গেলেন। মানুষ যেন তার মন্দিরে আসতে বাধ্য হয় সেজন্য তিনি ঠিক করলেন, মক্কার কাবাঘর ভেঙে ফেলবে।

সে মক্কায় হামলা করার জন্য একটি বিরাট এক সেনাবাহিনী তৈরি করল। আমাকেও সেই বাহিনীতে রাখল। সে চেয়েছিল যেন আমি তাকে পিঠে নিয়ে সবার আগে মক্কায় যাই। আগে যেমন আমি তার শত্রুদের ঘর ভেঙে দিয়েছি, তেমনি আমার এই বিশাল শরীরের ধাক্কায় কাবাঘর ভেঙে দিই।

অথচ সত্যি কথা কি জানো? আমার না এমন কাজ করতে একটুও মন চাচ্ছিল না। কিন্তু কি আর করা! তারা যেহেতু আমার মালিক তাই তাদের সঙ্গে আমাকে যেতেই হলো। রাজা আবরাহার সেনাদের সঙ্গে আমি চলতে লাগলাম। সেনারা তখন মক্কা, মক্কার মানুষজন, আর কাবাঘরের বিভিন্ন ঘটনা বলাবলি করছিল। আর আমি চুপটি করে তাদের কথা শুনছিলাম।

তাদের কথাবার্তা শুনে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমি জানলাম যে, কাবাঘর বানিয়েছিলেন মহান আল্লাহর একজন নবী, যার নাম ইব্রাহীম। তার ছেলে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-ও নবী ছিলেন। তারা দু'জন মিলেই বানিয়েছিলেন কাবাঘর। ইব্রাহীমের অনেক মু'জিযাহ্ ছিল। দুষ্টু লোকেরা তাকে আগুনে ফেলে দিয়েছিল কিন্তু তার কিছুই হয়নি।

আমি আরো জানলাম যে, এই কাবাঘর খুবই সম্মানিত। কাবাঘর মক্কায় অবস্থিত। মক্কার এ মসজিদ একটি নিরাপদ জায়গা। তোমরা যদি এই মসজিদে যাও তাহলে কেউ তোমাদের কোনো

* *অধ্যয়নরত, মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

ক্ষতি করতে পারবে না। এখানে অনেক কবুতর সারাদিন উড়ে বেড়ায়, কেউ কোনো কবুতর ধরে না, মারে না। এটা অনেক শান্তির জায়গা। মানুষ এই মসজিদকে ভালোবাসে, এখানে নামায পড়ে।

মক্কার লোকজন যখন জানতে পারলো যে, আমি সেনাবাহিনীর সাথে কাবাঘর ধ্বংস করতে যাচ্ছি, তখন তারা খুব ভয় পেল। কারণ তারা আমার শক্তির ব্যাপারে জানতো।

আমরা মক্কার একেবারে কাছে এসে পড়লাম। আর মাত্র একরাত! এরপর আর কাবাঘর থাকবে না। মক্কাও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর মক্কায় তো কোনো বাহিনীই নেই যারা আমাদেরকে বাঁধা দিবে। আমাদের বিজয়ের দরজা খোলা। মক্কা আর কাবাঘরের বাঁচার কোনোই সুযোগ নেই।

সেনাবাহিনীর লোকেরা যখন আমাকে দেখে বলছিল, আরে! আবরাহার হাতি! সবচেয়ে বড়ো হাতি! চলো! চলো! আমার যে কী খুশি লাগছিল!

আমরা খুব তাড়াতাড়ি মক্কার দিকে যেতে লাগলাম। এরই মধ্যে মক্কার সর্দার 'আব্দুল মুত্তালিব আমাদের কাছে চিঠি পাঠালো। তার চিঠি পড়ে কিন্তু আমার খুব ভয় হলো! আর অন্যরা মজা করতে লাগলো। আব্দুল মুত্তালিব যখন জানতে পারলো যে, রাজা আবরাহা আমাকে আর তার বিরাট সেনাবাহিনীকে নিয়ে কাবাঘর ধ্বংস করতে আসছেন, তখন তিনি একটুও ভয় না পেয়ে বললেন, কাবাঘরের তো একজন মালিক আছেনই, তিনিই কাবাঘরকে বাঁচাবেন।

'আব্দুল মুত্তালিবের এই কথা শুনে আমি ভয় তো পেলামই, আমি যে এত বড়ো হাতি, আমি যে চাইলেই যেকোনো শহর ভেঙে চুরমার করে দিতে পারি সেটাই ভুলে গেলাম। আমি আর হাটতেই পারলাম না। খুব ক্লান্ত হয়ে গেলাম। আর কী অবাক কাণ্ড! আমি একাই কিন্তু ক্লান্ত হইনি; বরং সবগুলো হাতি, ঘোড়া, উট সবারই এমন অবস্থা হলো। আমি আমার জায়গায় যেন বরফের মতো জমে গেলাম। আমার পা'গুলো যেন মাটিতে গেঁথে গেলো। মক্কার দিকে আমি আর এক পা'ও আগাতে পারলাম না।

রাজা আবরাহা আমার এই অবস্থা দেখে খুব বিরক্ত হলেন। তার সেনারা আমাকে পিছনে, ডানে, বামে যেদিকেই নিয়ে গেলো সেদিকেই যেতে পারলাম, শুধু সামনে মক্কার দিকে একটুও আগাতে পারলাম না। কী একটা বিপদ বলো তো! লোকেরা আমাকে বকা দিলো, গুতো দিলো, আগুন দিয়ে ভয় দেখালো, কিন্তু আমি তো একটুও হাটতে পারছি না।

হঠাৎ কী হলো জানো? কোত্থেকে যেন ঝাকে ঝাকে ছোট ছোট পাখি এসে আকাশ ঢেকে ফেললো। পৃথিবী হঠাৎ করেই অন্ধকার হয়ে গেলো। আমার একবার মনে হলো আমি স্বপ্ন দেখছি। আবার মনে হলো আমি জেগে আছি। হঠাৎ শুনি সেনারা সব চিৎকার করে বলছে, আরে এগুলো তো ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। এগুলো তো আমাদের মাথায় পাথর মারছে!

সত্যিই আমাদের উপর ছোট ছোট পাথর পড়তে লাগলো। কত ছোট জানো? চাল, গম এগুলো যেমন ছোট হয়, এত্ত ছোট। তোমরা হাসছো!

তাহলে শোনো। আমার একটা বন্ধু ছিল আমার মতোই বড়োসড়ো। এত্ত ছোট একটা পাথর যেই না তার উপর পড়লো, সাথে সাথেই সে মাটিতে পড়ে গেলো। আরেকটা পাথর সবচে' বড়ো উটটার পড়লো। সেও উল্টিয়ে পড়লো। সেনাবাহিনীর সবচে' মোটাসোটা যেই লোকটা ছিল, তার উপর একটা পাথর পড়লো। ওমা! এই ছোট একটা পাথরের আঘাতে সে মরেই গেলো। আর আমি কি করলাম জানো? চারপাশের অবস্থা দেখে ভয়েই কাঁপতে লাগলাম। ভয়ের চোটে আমি মাথা নিচু করে ফেললাম। আর তখনই দেখলাম একটা অদ্ভুত দৃশ্য। *[৪১ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

কবিতা

স্মৃতি

মোল্লা মাজেদ*

দু'দিনের খেলাঘরে কত রস রঙ্গ
থাকবে না এই দিন সব হবে ভঙ্গ।
জীবন সন্ধিক্ষণে কত কি যে পড়ে মনে
হারানো দিনের ব্যথা পিষে দেয় অঙ্গ
দু'দিনের খেলাঘরে কত রস রঙ্গ।

স্মৃতিময় দিনগুলো প্রীতিময় থাক
অতীতের গ্লানি সব ধুয়ে মুছে যাক।
গীতিময় সেই দিন বাজায় মনের বীণ
সুর সাধে সেই বীণে বনের বিহঙ্গ
দু'দিনের খেলাঘরে কত রস রঙ্গ।

কেন মানুষ হলাম

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

ওগো সঙ্গিনী, একটু চোখ মেলে দেখো না!
প্রীতির বন্ধনে নয়ন-কাজল করে রেখো না,
তুমি কি জানো?
মানুষ আজ পাপাশয়ে আচ্ছন্ন!
ওদের আলোর পথে ডাকতে হবে,
দু'জাহানে মুক্তি পাবো তবে।
আমাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে দাও
তুমিও আপন কাঁধে এ ভার তুলে নাও।
মোদের শত-সহস্র চেষ্টায়
যদি কোনো পথহারা পায়,
একবিন্দু সত্যের কিরণ, আমি হব পরম ধন্য।
নয়ন মেলে দেখো, কুকর্মে মানুষ হয়েছে বন্য!
এ যেন সর্বগ্রাসী নদী,
ছুটছে নিরবধি,
অভ্রংলিহ প্রাসাদ গড়তে,
বাধেনা বিবেক হরণ করতে,
স্বার্থের মোহে অর্থপানে,
ভেসে যাচ্ছে লোভের বানে।
হারাম হালাল ভুলে তারা,
অর্থের লোভে দিশেহারা!
অঢেল সম্পদ গড়তে হবে ভাবছে ক্ষণেক্ষণে,
দুনিয়ার মোহে মরার কথাও নেই যে মনে।
সত্য কথায় দেয় না মোটেও কান,
পরকাল ভুলে হয়েছে শয়তান।
ভাবখানা এমন! যেন হবে না মরণ!
বন্ধ হলেই শ্বাস হবে যে স্মরণ।
হিসেব দিতে হবে যখন,
বাঁচার পথ পাবে না তখন।
হে আল্লাহ!
এ ভার আমি বহন করতে পারব না
ওগো প্রভু তোমার কাছে আমার প্রার্থনা,
তুমি আমাকে ক্ষমা করো
ফের, মানুষ ছাড়া অন্য কিছু গড়ো।
চাঁদ হতে আমার বেজায় ইচ্ছে করে,
মিষ্টি হাসিতে দিতাম সবার মন ভরে,
যদি সূর্য বানাও কী যে খুশি হব
প্রচণ্ড শীতে দুঃখীদের সাথে রবো।
চাঁদের আড়ালে ঘুমাব তাদের সনে
সুখ-নিদ্রায় ডুববে তারা আমার উষ্ণে,
শুকতারা বানালে হবো, জোনাকির দোসর
কৃষ্ণ রাতের চোরা পথে পথিকের সহচর।
সুবিশাল পথ হলে পরে
পথিককে পৌঁছাতাম পিঠে করে।
তরু হলে দিতাম অক্সিজেন, বাঁচাতাম প্রাণ,
মানুষ ছাড়া অন্য কিছু বানাও, হে রহিম রহমান।
জল হলে প্রিয়পাত্র হতাম,
তৃষ্ণার্তের পিপাসা মিটাতাম।
হতাম যদি কচি-কাঁচার খেলনা?
আমাতে বইতো আহ্লাদের বন্যা।
বড় সাধ মনে, হলে আমি ফুল
সুবাসে মোর, ধরণী হতো মশগুল।
হতাম যদি কলম, খাতা, বই
সুশিক্ষা দিতাম নিশ্চই।
হৃদয়ে থাকত না কোনোই আক্ষেপ
বানাতেও যদি পায়ের জুতো
জ্বলতামনা নরকের অনলে
খেতামনা ফেরশতার গুঁতো!
কী লাভ? সেরা জীব হয়ে! হই যদি
নরকের খড়ি,
হে আল্লাহ! কলংকিত মানুষ হয়ে
যেন নাহি মরি!

[সমাপ্ত]

---

* *স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বরেণ্য কবি, রাজবাড়ি।*
* *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

জমঈয়ত সংবাদ

ধামরাই এলাকা জমঈয়তের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও কাউন্সিল অধিবেশন

গত ১৮ নভেম্বর ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা উদ্যোগে ধামরাই এলাকা জমঈয়তের আওতাধীন শাখা কমিটিগুলোর দায়িত্বশীলদের নিয়ে শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অডিটোরিয়ামে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ধামরাই এলাকার কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা শিক্ষক ক্বারী মাহমুদুল হাসান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখ ড. ফায়জুল আমীন সরকার মাদানী। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি শুরু হয় সকাল ১০টায়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ধামরাই এলাকা জমঈয়তের আহ্বায়ক মো. আব্দুর রাজ্জাক। প্রশিক্ষণ অধিবেশনে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ। প্রশিক্ষক হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা প্রধান মুহাদ্দিস শাইখ নজরুল ইসলাম সরকার। প্রধান অতিথি ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী প্রশিক্ষণ অধিবেশনে ধামরাই এলাকার বিভিন্ন শাখার দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। মধ্যহ্ন বিরতির পর বেলা ২টা থেকে কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ মো. বাশীর উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ। কাউন্সিল ও প্রশিক্ষণ অধিবেশনে প্রায় ২০০ জন দায়িত্বশীল-সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কাউন্সিল অধিবেশনে এলাকা জমঈয়তের সভাপতি হিসেবে মো. আব্দুর রাজ্জাক, সহ-সভাপতি যথাক্রমে মো. মোবারক হোসেন, মাওলানা আব্দুর রউফ ও শাইখ আব্দুল ওয়াহাব এবং সেক্রেটারি হিসেবে শাইখ আব্দুল গনীকে নির্বাচিত করা হয়।

গঠিত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– শাইখ মাহমুদুল হাসান- কোষাধ্যক্ষ, শাইখ মো. আতাউর রহমান-সহকারী সেক্রেটারি, শাইখ মো. সোলাইমান-সাংগঠনিক সেক্রেটারি, শাইখ মো. তরিকুল ইসলাম- দাওয়া ও তাবলীগ সম্পাদক, আলহাজ্জ মো. মফিজুল ইসলাম-প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক, শাইখ মো. জাহিদুল ইসলাম-শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক, আলহাজ্জ মো. শাহজাহান-মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক, আলহাজ্জ মো. সানোয়ার হোসেন- সমাজ সেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক, মো. ইমরান হোসেন- পাঠাগার সম্পাদক, মো. আব্দুল হাদী- দপ্তর সম্পাদক।

সদস্যবৃন্দ– মো. আব্দুল হালিম, মো. আবুল কালাম, মো. আলমগীর হোসেন, মো. আলী আজম, মো. আব্দুর রহিম, মাস্টার বেলায়েত হোসেন, আলহাজ্জ মো. শহিদুল ইসলাম, মো. মোতালেব হোসেন ও মো. আব্দুল মালেক।

কার্যকরী কমিটির ২৫জন দায়িত্বশীলকেই পরবর্তী ৩ বছরের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয় এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে অবহিত করা হয়। উভয় অধিবেশন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও স্বার্থকরূপে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দিনাজপুরে গঠনতন্ত্র ও বইপাঠ প্রতিযোগিতার পরীক্ষা এবং সুধী সমাবেশ

গত ২৫ নভেম্বর শনিবার দিনাজপুর জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের যৌথ উদ্যোগে উভয় সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও বইপাঠ প্রতিযোগিতার পরীক্ষা এবং সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল আল-মাদানীর সভাপতিত্বে তারই প্রতিষ্ঠিত রাযিয়া হিফযুল কুরআন এন্ড ইসলামিক একাডেমি জামে মসজিদে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি হাফেয আতিকুর রহমান ইবনে আবু তাহের বর্ধমানী, মাওলানা আব্দুল মমিন,

মাওলানা এহসানুল্লাহ, শাইখ বদিউজ্জামান মাদানী, শাইখ নুরুল আলমমাদানী প্রমুখ।

শুব্বান দায়িত্বশীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা শুব্বান সভাপতি শাইখ আব্দুর রহমান ইমরান আল-মাদানী, সহ-সভাপতি শাইখ এনামুল হক মাদানী, সেক্রেটারি হাফেয রাশেদুল ইসলাম, যুগ্ম সেক্রেটারি শাইখ বোরহান উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও উপজেলা জমঈয়ত হতে আগত সভাপতি, সেক্রেটারি ও অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন দিনাজপুর জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাওলানা মো. মোখতার হোসেন শেখ।

বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে সাংগঠনিক কার্যক্রম

গত ০১ ডিসেম্বর ২০২৩ শুক্রবার বাদ 'আসর বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে চরগ্রাম খেয়াঘাট আহলে হাদীস জামে মসজিদ শাখায় জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শাখা জমঈয়তের সভাপতি মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। সাখা শুব্বানের সদস্য মো. ইব্রাহীম-এর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় বাগেরহাট জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব মো. আলতাফ হোসেন, সহ-সভাপতি এনামুল হক মুকুল, সদর এলাকার জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি মো. সাখাওয়াতুল ইসলাম, জেলা শুব্বান সেক্রেটারি হাফেজ মুহাম্মদ আল মামুন, শুব্বান সদস্য হাফেজ রাসেদুল হক বুনান ও এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতা কর্মী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

একই দিন বাদ মাগরিব মহান আল্লাহর দান আহলে হাদীস জামে মসজিদে শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীসের শাখার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুর রশিদ-এর সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মহান আল্লাহর দান জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। শাখা বৈঠকে জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেলা সেক্রেটারি মো. আলতাফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মো. ইউসুফ আলী, সদস্য মো. ফাহমিদ, এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি মো. সকাওয়াতুল ইসলাম শাখা সহ-সভাপতি মো. হাফিজুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ ডা মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনসহ শাখা জমিয়াতের সদস্য ও শুব্বান সদস্য বৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন শাখা সেক্রেটারি মো. শহিদুল ইসলাম। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিনের দরবারে দু'আ প্রার্থনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা।

শালবন মিস্ত্রিপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদের বর্ধিত অংশের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন

'রংপুর শহর এলাকা জমঈয়ত' জেলা জমঈয়তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। জেলার অধিকাংশ কার্যক্রম শহর এলাকাতেই বাস্তবায়িত হয়। শহর এলাকা জমঈয়তের দাওয়াতি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এলাকার ১৪টি শাখা মসজিদে সাপ্তাহিক দরস ও অন্যান্য কর্মসূচি অব্যাহত আছে এবং দিন দিন মুসল্লি সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিধায় রংপুর শহরের শালবন মিস্ত্রিপাড়া আহলে হাদীস বড়ো মসজিদের সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ৪ ডিসেম্বর সোমবার সকাল ১১টায় মসজিদের বর্ধিত অংশে ৫ তলার ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন উপলক্ষে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও জেলা জমঈয়তের প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ মো. মোস্তাফিজার রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জমঈয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও হারাগাছ ইলাকা জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ মো. মাহমুদার রহমান (পরিচালক, মতি গ্রুপ) ও জেলা শুব্বানের উপদেষ্টা আলহাজ্জ মো. শাহজাহান কবিব (এম.ডি, থাই ইন্টারন্যাশনাল, রংপুর)। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মসজিদের পেশ ইমাম শাইখ আবু তাহের। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মসজিদে মোতাওয়াল্লি, রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ডা. মাসুদার রহমান।

সভাপতিত্ব করেন মসজিদ কমিটির সভাপতি মো. তোফাজ্জল হোসেন এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মো. কামরুজ্জামান হেলাল। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন জেলা জমঈয়তের পাঠাগার সম্পাদক মওলানা সিরাজুল ইসলাম। *[তথ্য প্রদানে– মুহাম্মাদ সাঈদুল হক, জেলা সাংগঠনিক সেক্রেটারি রংপুর জেলা জমঈয়ত]*

গাইবান্ধায় দারুল আমান জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদের উদ্বোধন

গত ১৭ নভেম্বর শুক্রবার, গাইবান্ধা জেলা সদরের কিশামত বালুয়ায় "দারুল আমান জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদ-এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী খুতবাহ্ প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আকন্দ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন– গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের কোষাধ্যক্ষ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুশ শাফী মিয়া, তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান খান, পাঠাগার সম্পাদক মো. আনিসুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মো. মুজিবুর রহমান, উত্তর গাইবান্ধা এলাকা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক সালাফী, কুপতলা তিনপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আব্দুল ওয়ারেস প্রমুখ। এছাড়াও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জমঈয়তের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও মুসুল্লীগণ উপস্থিত ছিলেন।

শুব্বান সংবাদ

ঢাকা জেলার ২১টি মসজিদে শুব্বানের দাওয়াহ ও তাবলীগী সফর

গত ১৭ নভেম্বর শুক্রবার, কেন্দ্রীয় শুব্বানের দাওয়াহ্ ও তাবলীগী সফর কেন্দ্রীয় দফতর যাত্রাবাড়ি জমঈয়ত ভবন সকাল ৮টায় শুরু হয়। এ সফরে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক। ঢাকা জেলার ২১টি মসজিদে সফরকারী নেতৃবৃন্দ জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। সফরকারী নেতৃবৃন্দ ধামরাই এলাকায় পৌঁছানোর স্থানীয় জমঈয়ত ও শুব্বান নেতাকর্মীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ধামরাই বাজার কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এক সংক্ষিপ্ত সভায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা শাইখ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী খতীবদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি প্রত্যেক মসজিদের জন্য সৌদি আরবের ছাপা একসেট তাফসীর, দু'আর বই, শুব্বানের চাবির রিং, ফর্‌য সলাত পর পঠনীয় আযকার (ফেস্টুন) খতীবদের নিকট হস্তান্তর করেন।

ধামরায় এলাকার বিভিন্ন মসজিদে খুতবা প্রদান করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, শরিফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস শাইখ নজরুল ইসলাম, আল কাসিম দাওয়া সেন্টারের সাবেক দাঈ শাইখ মোশাররফ হোসেন, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতিবৃন্দ যথাক্রমে অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, মো. রেজাউল ইসলাম ও শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাইখ রবিউল ইসলাম, ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক শাইখ নুরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সহ-সভাপতি জাহিদ হাসান মাদানী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ গাজী, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক হাফিজুর রহমান মাদানী, আইন বিষয়ক সম্পাদক মো. মাসুদুর রহমান, ক্বারার সদস্য আব্দুর রহমান মাদানী, আম সদস্য আশরাফুল ইসলাম, মোহাম্মদপুর মডেল মাদ্‌রাসার শিক্ষক শাইখ আব্দুল্লাহ, আলহাজ্জ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার শিক্ষক শাইখ শরিফুল ইসলাম, কুষ্টিয়া ইসলামী ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থী আব্দুর রহমান মোস্তাফিজ ও আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। এতে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন এলাকার নেতৃবৃন্দ।

দু'আর আবেদন

কেন্দ্রীয় শুব্বানের সালেক সদস্য ও চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির মেধাবী শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আবু তালহা স্পাইনাল কর্ডের সমস্যায় ভুগছেন। বর্তমানে তিনি ভারতের চেন্নাই'র একটি হসপিটালে চিকিৎসাধীন আছেন। সকলকে তার সুস্থতার জন্য দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‘আত, প্রত্যেকটি বিদ্‘আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***মসজিদের নিচে টয়লেটের হাউজ থাকলে সে মসজিদে সালাত আদায় করা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

মাহবুব আলম
বরিশাল সদর, বরিশাল।

জবাব : স্বাভাবিক অবস্থায় সালাত সহীহ হওয়ার জন্য জায়গা পবিত্র হওয়া শর্ত। নাপাক স্থান ও সালাত পড়ার জায়গার মাঝখানে কোন ছাদ বা দেয়াল দ্বারা আবৃত থাকলে তা পবিত্র বলেই গণ্য হবে এবং তাতে সালাত আদায় সহীহ হবে। ***(আল-লাজনা আদ-দায়িমাহ- ফা. ২০২৯৯)***। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আমাদের এলাকার এক মুসল্লি মসজিদ ও মাদ্‌রাসার সেক্রেটারি বরাবর কিছু সম্পত্তি লিখে দিয়েছেন এই শর্তে যে, সম্পদদাতা আজীবন মসজিদ ও মাদ্‌রাসার সভাপতি থাকবেন এবং তার বংশানুক্রমিক সভাপতি থাকবে। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তার দান সঠিক কি-না জানতে চাই এবং ওই মসজিদে সালাত হবে কি-না? আশা করছি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল ভিত্তিক উত্তর প্রদান করে উপকৃত করবেন।***

মো. সোহেল আহম্মদ
গাবতলী, বগুড়া।

জবাব : মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মুতাওয়াল্লী জরুরি। আর মসজিদের জায়গা ওয়াক্‌ফ করার সময় বিনা পারিশ্রমিকে সেবা দেবে এ শর্তে ওয়াক্‌ফ সহীহ– ***(রাওযাতুত তালিবীন- অধ্যায় : ‘ওয়াক্‌ফ, ৩৪৭)***। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কল্যাণ লাভের আশায় আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ হতে যা ওয়াক্‌ফ করা হয়, তা ওয়াক্‌ফকারী যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করেছেন– তা শরীয়তসম্মত হলে– সেই কাজেই কেবল ব্যয় করতে হবে। অন্য কোনো কাজে ব্যয় করা সাধারণত জায়িয নয়। কেননা ওয়াক্‌ফের বিধান হলো, তা বিক্রয় করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং কাউকে তাতে উত্তরাধিকার বা ওয়ারিস করা যাবে না। এ নীতিমালা সকল প্রকার ওয়াক্‌ফের বেলায় প্রয়োজ্য। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেন :

«تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ».

অর্থাৎ- “তুমি তার মূলসহ দান করে দাও! এটা বিক্রয় করা হবে না, কাউকে দান করা হবে না এবং কাউকে ওয়ারিস করা হবে না”– *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৩৭, ২৩১৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৩২ ও ১৬৩৩; সুনানে আবূ দাউদ- হা. ২৮৭৮; সুনানে আত্ তিরমিযী- হা. ১৩৭৫; সুনানে আন্ নাসায়ী- হা. ৩৫৯৭ ও ৩৬০১; সুনানে ইবনু মাজাহ্- হা. ২৩৯৬)*। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***মেয়েরা কি মাহরাম ছাড়া হোস্টেলে থেকে একা একা পড়াশোনা করতে পারবে? ইসলাম এই বিষয়ে কী বলে?***

মো. শাকিল আলী
নবাবজাইগির রহমানিয়া মাদ্‌রাসা।

জবাব : মেয়েদের যাতায়াতে সাথে মাহরাম থাকা শর্ত। মাহরাম ছাড়া দূরে একাকী সফর করা যাবে না। এ মর্মে বিশুদ্ধ হাদীস হলো–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী (ﷺ) বলেন, “মাহরাম ছাড়া কোনো মহিলা যেন সফর না করে”– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ১৭২৯ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৯১)***। তবে হোস্টেলে থেকে লেখাপড়ার জন্য মাহরাম সাথে থাকা আবশ্যক নয়। এ ক্ষেত্রে ছাত্রীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা আবশ্যক। যদি হোস্টেলে বেগানা পুরুষের আনাগুনা না থাকে এবং পর্যাপ্ত নিরাত্তা নিশ্চিত থাকে, তাহলে এরূপ হোস্টেলে থেকে মেয়েদের লেখাপড়া করাতে কোনো আপত্তি নেই। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***অনেক সময় মানুষ মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে। মৃত ব্যক্তি জীবিতদের প্রতি নানা উপদেশ, সতর্কবাণী ইত্যাদি দিয়ে থাকে। স্বপ্নের মাধ্যমে এসব খবরাখবরের কোনো ভিত্তি আছে কি? এছাড়া মৃত্যুর পর মানুষ স্বপ্নে দেখা দিতে পারে কি?***

মো. রামিম সানি
পাবনা সদর, পাবনা।

জবাব : মানুষ কখনো মহান আল্লাহর তরফ থেকে, কখনো শয়তানের প্ররোচনায় কিংবা নিজের কল্পনা থেকে স্বপ্ন দেখে। নবীগণের স্বপ্ন ওহী এবং তাঁদের অনুমোদিত স্বপ্নও ওহীর শ্রেণিভুক্ত– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৮৫৯)***। তাছাড়া অন্য কারো স্বপ্ন কোনো হুকুম বা বিধান সাব্যস্ত করে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ভালো কিছু দেখলে মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে। আর খারাপ কিছু দেখলে বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করে পার্শ্ব পরিবর্তন করে শুয়ে পড়বে। তাহলে ঐ স্বপ্ন কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৯২ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২২৬১)***। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ইমাম ভুল করে চার রাকআতের স্থানে পাঁচ রাকআত নামায পড়ে সাহু সাজদাহ্ দিয়েছে, এ অবস্থায় একজন মুসল্লির এক রাকআত ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু ইমামের ভুলের কারণে তার চার রাকআত হয়ে গেল। এখন কি সে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে না-কি আরো এক রাকআত পড়বে?

মো. সজীব
কুটিপাড়া, পাবনা।

জবাব : ফর্‌য সালাতের রাকআত সংখ্যা শরীয়ত নির্ধারিত। ইমাম ভুল করে চার রাকআতের বদলে পাঁচ রাকআত পড়েছেন। অতঃপর তিনি সাহু সিজদাহ্ দিয়েছেন, তাতে সালাত সহীহ হয়ে গেছে। কিন্তু পরে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ইমামের সাথে যেহেতু চার রাকআত পুরা করেছেন, তাই তাকে আর বেশি পড়তে হবে না। কেননা সালাত যেহেতু চার রাকআত বিশিষ্ট, সেহেতু অতিরিক্ত পড়ার কোনো বিধান নেই। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৬) : আমি পেশায় একজন ড্রাইভার, পাবনা টু ঢাকা। সালাতের সময় গাড়িতে থাকি, গাড়ি থামিয়ে সালাত পড়লে ম্যানেজার বকাঝকা করে এবং চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই ক্ষেত্রে কি সালাত জমা করতে পারব? এবং রাস্তা তো অনেক, সালাত কসর করতে পারব কি-না? কসর করলে কোথা থেকে শুরু করব? দয়া করে বিস্তারিত জানাবেন।

আ. মান্নান
কুটিপাড়া, পাবনা।

জবাব : সফর অবস্থায় ক্বসর করা মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীর অন্যতম। ইসলাম যে সর্বজনীন এবং সহজ দ্বীন, এটাই তার প্রমাণ। সফরের ক্লান্তির মাঝে আল্লাহ তা'আলা সালাতকে ক্বসর করার সুযোগ দিয়েছেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে ক্বসর করাই উত্তম। তবে কেউ চাইলে পুরো সালাত আদায় করাতে কোনো অসুবিধা নেই। ক্বসর করার বিধানের দলিলেই এটার প্রমাণ বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾

"আর যখন তোমরা যমীনে চলো, তখন সালাত ক্বসর করাতে কোনো দোষ নেই। যদি তোমরা কাফিরদের ফিতনার আশংকা করো। নিশ্চায়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" *(সূরা আন্ নিসা : ১০১)*

নবী (ﷺ)-কে ভয়-ভীতি ছাড়া ক্বসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (ﷺ) বলেন : "এটি একটি সাদাক্বাহ্। আল্লাহ তদ্বারা তোমাদেরকে সাদাক্বাহ্ করেছেন। কাজেই তোমরা তার সাদাক্বাকে গ্রহণ করো।" *(মুসলিম- হা. ৬৮৬)*

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "আমরা যখন তোমাদের (মুক্বীম) সাথে হই, তখন ৪ রাকআত পড়ি। আর যখন আমাদের (মুসাফিরদের) দলে ফিরে যাই, তখন ২ রাকআত পড়ি। এটি আবুল ক্বাসেম মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সুন্নাত।" *(বুখারী- ১০৮২; আহমাদ- ১৮৬২; মুসলিম- হা. ৬৮৮)*

উপরোক্ত দলিলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহর হাদিয়া গ্রহণ করে ক্বসর ও যোহর-'আসর একসাথে এবং মাগরিব-'ইশা একসাথে জমা করে সালাত আদায় করতে পারবেন। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : সাহাবী কাকে বলে? সাহাবীদের মর্যাদা পবিত্র কুরআন দিয়ে জানাবেন। বর্তমান আলেম ও সাহাবীদের মধ্যে পার্থক্য জানাবেন।

মো. রামীম সানি
পাবনা সদর, পাবনা।

জবাব : সাহাবী অর্থ সাথী। এখানে ঐ সব সৌভাগ্যবান মুসলিমগণকে বুঝায়, যাঁরা ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁরাই এ উম্মাতের সোনালী যুগের সোনার মানুষ। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহান কৃতকার্যতা"– *(সূরাহ্*

আত্ তাওবাহ্ : ১০০)। কাজেই সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-গণের মর্যাদা বুঝার জন্য আল-কুরআনের এ আয়াতই যথেষ্ট।

আর এ সমাজের আলেমগণ অবশ্যই তাঁরা স্ব-স্ব জায়গায় সম্মানিত। কিন্তু সাহাবাগণের সাথে কোনোভাবে তোলনীয় নয়। এ মর্মে রাসূল (ﷺ) বলেন :

«فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيْفَهُ».

“অতএব ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার জীবন। তোমরা যদি উহূদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণভাণ্ডার মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করো, তবুও তোমরা আমার সাহাবীর এক মুষ্টি বা তার অর্ধেকের সমান হবে না”– ***(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৬১, সহীহ)***। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ‘উমরাহ্ পালনের নিয়মাবলী সংক্ষেপে জানালে উপকৃত হতাম।

আবুল ফজল
মিরপুর, ঢাকা।

জবাব : ‘উমরাহ্ করার নিয়ম– তালবিয়া পড়তে পড়তে হারামে পৌঁছবে– ***(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৫৯৯, আল-বানী : সহীহ)***। তালবিয়া হলো–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ : “লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা, লা-শরীকা লাকা লাব্বাইকা। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি‘য়মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক। লা-শরীকা লাকা।”

অর্থ : “আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির। আপনার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত আপনারই। আপনার কোনো শরীক নেই।”

ইহরামের উপরের কাপড়টি ডান বগলের নিচ দেয় এনে বাম কাঁধের উপর রাখবে। এটাকে ‘ইজতেবা’ বলা হয়। এরপর হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে ‘বিস্‌মিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার’ বলে কা‘বাকে বামে রেখে ঘুরবে। এটাকে তাওয়াফ বলে। তাওয়াফের কোনো নির্ধারিত দু‘আ নেই। ‘উমরাহ্কারী ইচ্ছেমত প্রয়োজনীয় দু‘আ করবে এবং রূকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে একটি দু‘আ নির্ধারিত আছে, তা পাঠ করবে। দু‘আটি হলো–

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ.

উচ্চারণ : “রাব্বানা আ-তিনা ফিদ দুন্ইয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাত অ‘ক্বিনা আযাবান না-র।” ***(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৬৬৬, আল-বানী : সহীহ)***

এভাবে হাজরে আসওয়াদ বরাবর আসলে এক চক্কর হবে। ১ম চক্করের মতো আরো ৬টি চক্কর দিয়ে মোট ৭ চক্কর পুরা করবেন। এরপর ‘মাকামে ইব্‌রাহীম’-এ অথবা হারামের যে কোনো যায়গায় ২ রাকআত তাওয়াফের সুন্নাত আদায় করবেন। এ সময় ইহরামের উপরের কাপড় দিয়ে ডান কাঁধ ঢেকে নেবেন। কেননা, কাঁধ খোলা রাখলে সালাত হয় না। এ ২ রাকআত সালাতে ১ম রাকআতে সূরাতুল ফাতিহাহ্ পড়ার পর ‘বিমিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রাহীম’ বলে সূরাতুল কাফিরূন এবং ২য় রাকআতে সূরাতুল ইখলাস পড়া ভালে। অন্য যে কোনো সূরা বা কয়েকটি আয়াত পড়লেই চলবে। অতঃপর সম্ভব হলে যম্‌যমের পানি পান করবেন এবং দু‘আ করবেন। যম্‌যমের পানি পান করে দু‘আ করলে দু‘আ কবুল হয়। তারপর সাফা পাহাড়ের দিকে উঠতে থাকবেন এবং কুরআনের এ আয়াতখানা পড়বেন :

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾

উচ্চারণ : “ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিংশা‘আইরিল্লাহ। ফামান হাজ্জাল বাইতা আভি‘য় তামারা, ফালা-জুনা-হা ‘আলাইহি আঁইয়্যাত্বত্বাওয়্যাফা বিহিমা। ওয়া মাংতাত্বাওয়্যা‘আ খাইরাং ফা ইন্নাল্লা-হা শা-কিরুন ‘আলীম।” ***(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ১৫৮)***

এরপর পড়বেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

উচ্চারণ : “লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু, লা-শরীকা লাহু, লাহুল মুল্কু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা-কুল্লি শাইইংক্বাদীর। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু, আনজাযা ওয়া‘য়দাহু, ওয়া নাসারা ‘আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু।”

অর্থ : “আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া কোনো সত্যিকারের ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব ও যাবতীয় প্রশংসা তাঁর এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া কোনো সত্যিকারের ইলাহ নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা

পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সব দলকে একাই পরাস্ত করেছেন।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১২১৮)*

এটা পাঠ করার পর কিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে মনের ইচ্ছামতো মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। তার পর ডান দিক দিয়ে দু'আ, যিক্র, কুরআন তিলাওয়াত ও দরূদ পড়তে পড়তে মারওয়া পাহাড়ের দিকে যাবেন। এর মাঝে দেখতে পাবেন ২টি সবুজ দাগ। এ ২ দাগের মাঝখানে পুরুষগণ একটু দ্রুত পার হবেন। এভাবে মারওয়ায় পৌঁছলেই ১ চক্কর হয়ে যাবে। সাফা পাহাড়ে যেভাবে উপরোক্ত আয়াত ও কালিমা পাঠ করেছিলেন, ঠিক মারওয়া পাহাড়েও তা পাঠ করবেন। তারপর একই নিয়মে মারওয়া থেকে সাফা পাহাড়ে আসবেন। এখানে সাফা থেকে মারওয়ায় গেলে ১ চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফায় আসলে আরেক চক্কর হয়ে যাবে। মোটকথা সাফা থেকে সা'য়ী বা চক্কর শুরু করবেন এবং মারওয়ায় গিয়ে চক্কর পূর্ণ করবেন। অতঃপর পুরুষগণ মথা মুণ্ডন করবেন কিংবা চুল সমানভাবে ছোট করে কাটবেন। আর মহিলাগণ তাদের চুলের অগ্রভাগ থেকে হাতের ছোট আঙ্গুলির ১টিপ পরিমাণ চুল কেটে নেবেন– ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩০৩)***। এভাবে 'উমরাহ্ পূর্ণ হয়ে যাবে। এবার গোসল করে ইহরাম ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক কাপড় পরবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার 'উমরাহ্ কবুল করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (০৯) : সালাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কুরআন তিলাওয়াত পদ্ধতি কেমন ছিল?

ইমরুল কায়েস
দৌলতপুর, খুলনা।

জবাব : সালাতের শ্রেণিভেদ রয়েছে। যেমন- ফর্য, নফল, একাকী কিংবা জামা'আতবদ্ধ সালাত। জামা'আতে সালাত আদায়কালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসল্লিদের প্রতি নজর রাখতেন। অবস্থাভেদে কখনও সংক্ষিপ্ত ক্বিরআত বা দীর্ঘ ক্বিরাআত পাঠ করতেন। তিনি সাধরণতঃ সূরার শুরু থেকে ক্বিরআত আরম্ভ করতেন এবং অধিকাংশ সময় তা পূর্ণ করতেন। কখনও একটি সূরা দু'রাকআতে ভাগ করে পড়তেন। আবার কখনও একই রাকআতে দুই বা ততোধিক সূরা পাঠ করতেন। নফল সালাত দীর্ঘ করতেন। সির্রী বা চুপি সারে কিরআত পাঠ করার সময় মধ্যে মধ্যে একটু আওয়াজ করতেন। ফলে পিছনের কোনো কোনো মুসল্লি শুনতে পেতেন। ***(দেখুন : ইমাম ইবনু কাইয়্যিম "যাদুল মা'আদ" মুয়াস্সাতুর রিসালাহ বাইরুত- ১/২০২-২০৯ ও শাইখ আলবানী প্রণীত 'সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি (ﷺ)' নামক কিতাব)***

আমি একটা হাতি!

[৩৩ পৃষ্ঠার পর]

দেখি আকাশ আর মাটির মাঝে খুব সুন্দর আলো। মক্কার চারপাশ জুড়ে শুধু আলো আর আলো। আর দেখলাম দূরে 'আব্দুল মুত্তালিব দাঁড়িয়ে আছেন। মানুষজন তাকে ভালোবাসা জানাচ্ছে। রাজা আবরাহার বাহিনী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা মক্কায়ই ঢুকতে পারেনি। কাবাঘর ধ্বংস করা তো দূরের কথা।

'আব্দুল মুত্তালিব সবাইকে তার স্বপ্নের কথা বললেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তার পিঠ থেকে একটি রূপার শিকল বের হয়েছে। যার এক প্রান্ত মাটিতে আরেক প্রান্ত আকাশে। অনেক মানুষ সেই শিকল ধরে ঝুলে আছে। একটু পর একটি গাছ আর গাছের পাতায় খুব সুন্দর আলো।

সবাই এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় কি বললো শুনবে? তারা বললো, 'আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে 'আব্দুল্লাহর একটি ছেলে হবে। আর পুরো পৃথিবীর মানুষ একসময় সেই ছেলের অনুসরণ করবে। কী সুন্দর অর্থ তাই না?

তারা 'আব্দুল মুত্তালিবকে জিজ্ঞেস করলো, 'আব্দুল্লাহর ছেলের কী নাম রাখবেন? তিনি বললেন, আমি তার নাম রাখবো মুহাম্মাদ। মুহাম্মাদ অর্থ জানো? মুহাম্মাদ অর্থ সবাই যাকে ভালো বলে, যার প্রশংসা করে।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্মের সাথে সাথে আমার ঘটনা শেষ হলো। রাজা আবরাহা আর তার বিরাট বাহিনীর গল্পও শেষ হলো। তারা মক্কার কোনোই ক্ষতি করতে পারলো না। মক্কা শহর যেমন ছিল তেমনি রইল। কাবাঘর যেমন ছিল তেমনি থাকল। এখনো তেমনি আছে। আল্লাহ তা'আলা যতদিন চান তেমনি থাকবে। কেউ কাবাঘরের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

তোমরা নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মত। তোমরা সবাই দিনে পাঁচবার কাবাঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়ো। কী! পড়ো না? ❑

প্রচ্ছদ রচনা

আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংভুক্ত সৌদি আরবের শীর্ষ দশ ইউনিভার্সিটি

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

[দ্বিতীয় পর্ব]

কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়

আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের মালভূমি নজদ অঞ্চলে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়। এটি মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ র‍্যাংকিং অর্জনকারী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির অধীনে রয়েছে প্রায় বাইশটির বেশি কলেজ যা আন্তর্জাতিক ও দেশীয় শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্বমানের স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে আধুনিক সৌদি আরবের দ্বিতীয় রাজা, বাদশাহ সৌদ বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের নামে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় নামে বাদশাহ সৌদ বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ কর্তৃক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তিতে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ খালিদ বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করে বাদশাহ সৌদের নামে রাখা হয়। টাইমস হায়ার এজ্যুকেশন (২০২২)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সপ্তম সেরা আরব বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্থান পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের সেরা ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। যার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংক (২০২১) : ৪০১-৫০০। সৌদি আরবের র‍্যাংক (২০২১) : ৩। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবছর কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বৃত্তির আওতায় সুবিধাসমূহ হলো সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশুনা করবার সুযোগ, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ফ্রী আবাসন ব্যবস্থা, নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য এককালীন ২৭০০ রিয়াল, কোর্স চলাকালীন প্রতি মাসে ৮৫০ রিয়াল মাসিক ভাতা, তাছাড়াও শিক্ষার্থীদের ভালো রেজাল্টের জন্য বাৎসরিক পুরস্কার ১০০০ থেকে ৫০০০ রিয়াল, ফ্রি যাতায়াত টিকেটসহ প্রতি বছর ৩ মাসের ছুটি প্রদান করা হয়।

কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এন্ড মিনারেলস

সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলে পারস্য উপসাগরের তীরে সৌদি তেল শিল্পের প্রশাসনিক কেন্দ্র পুরানো সৌদি বন্দর শহর ধাহরানে অবস্থিত একটি সর্বজনীন গবেষণা বিদ্যাপীঠ কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এন্ড মিনারেলস। বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছে আধুনিক সৌদি আরবের পঞ্চম শাসক, বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের নামে। বিশ্ববিদ্যালয়টির অধীনে রয়েছে প্রায় সাতটির বেশি কলেজ যা দেশটির ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে পেট্রোলিয়াম এবং খনিজ বিষয়ে বিশ্বমানের স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ সৌদ বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের রাজকীয় আদেশে পেট্রোলিয়াম এবং খনিজ কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯,৫০০ এর বেশি। টাইমস হায়ার এজ্যুকেশন (২০২৩)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চতুর্থ সেরা আরব বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্থান পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সেরা ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের সেরা ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। যার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংক (২০২১) : ৫০১-৬০০। সৌদি আরবের র‍্যাংক (২০২১) : ৪। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

আলোকিত ভুবন

ঈমান, ইসলাম ও ইহসান প্রসঙ্গ

গ্রন্থনা : আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান

❖ আরকানুল ইসলাম বা ইসলামে মৌলিক স্তম্ভ কয়টি ও কী কী?

আরকানুল ইসলাম বা ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ ৫টি। যথা-

০১. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল।

০২. (প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত) সালাত প্রতিষ্ঠা করা।

০৩. (নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে) যাকাত আদায় করা।

০৪. (সামর্থ্যবানদের জন্য) হজ্জ সম্পাদন করা এবং

০৫. প্রতি বছর রমযান মাসব্যাপী সওম পালন করা।

❖ আরাকানুল ঈমান বা ঈমানের মৌলিক স্তম্ভ কয়টি ও কী কী?

ঈমানের মৌলিক স্তম্ভ বা আরকানুল ঈমান ৬টি। যথা-

০১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা;

০২. ফেরেশ্তাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনক করা;

০৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা;

০৪. প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা;

০৫. পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং

০৬. ভাগ্যে ভালো-মন্দের ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা।

❖ তাওহীদ পরিচয় ও প্রকারভেদ কী কী?

তাওহীদ অর্থ একত্ববাদ। অর্থাৎ- সুমহান আল্লাহ তা'আলা অদ্বিতীয় একক সত্তা। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একক সত্তাকে স্বীকার এবং মনেপ্রাণে সেই বিশ্বাস লালন ও প্রতিপালন করার নাম তাওহীদ।

তাওহীদ তিন প্রকার :

০১. তাওহীদ রবূবিয়্যাত। অর্থাৎ- সমগ্র বিশ্ব পরিচালন ও প্রতিপালনে সুমহান আল্লাহ'র একক কর্তৃত্ব।

০২. তাওহীদ উলুহিয়্যাত। অর্থাৎ- 'ইবাদত পাওয়ার একমাত্র অধিকারী হিসেবে আল্লাহ'র একত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

০৩. তাওহীদ আসমা-উস্-সিফাত। অর্থাৎ- সুমহান আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় গুণবাচক নামের যথার্থতা একমাত্র তাঁর জন্য খাস।

❖ কোন কোন মৌলিক বিষয়ের প্রতি জ্ঞানার্জন করা ফর্য?

তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন করা ফর্য। যথা-

০১. সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা;

০২. দীন তথা ধর্মীয় বিধি-বিধানের জ্ঞানার্জন করা এবং

০৩. নবী মুহাম্মদ (ﷺ) সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা।

❖ কবরে মানুষ কোন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে?

মানুষকে কবরস্থ করার পর সে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তা হলো–

০১. কে তোমার রব বা প্রতিপালক?

০২. তোমার দীন বা জীবনব্যাবস্থা কী ছিল?

০৩. কে তোমার রাসূল?

❖ ঈমানের স্তর বা অংশ কয়টি ও কী কী?

ঈমান তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা-

০১. ইকরার বিল লিসান (মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান)

০২. তাসদিক বিল যিনান (অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন)

০৩. 'আমল বিল আরকান (কর্মে সম্পাদন করা)।

❖ 'আমলগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মু'মিনদের স্তর কয়টি ও কী কী?

'আমলগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মু'মিন তিন প্রকারের। যথা-

০১. সাবিকূনা ইলাল খয়রাত অর্থাৎ- কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। তারা ঐ শ্রেণির, যারা ফর্য, নফল ও মুস্তাহাবসমূহ যথাযথ সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ থেকে পরিপূর্ণ বিরত থাকে।

০২. মুকতাসিদূন অর্থাৎ- মধ্যমপন্থী ঈমানদার। তারা কেবল ফর্যসমূহ সম্পাদন করে এবং হারাম বর্জন করে চলে এবং

০৩. যালিমূনা লি-আন্ফুসিহিম অর্থাৎ- নিজেদের উপর যুলুমকারী। তারা ঐ শ্রেণির, যারা সৎকার্য সম্পাদন করে, আবার মন্দকার্যও সম্পাদন করে।

❖ ঈমানে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখা কী?

০১. ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান এবং

০২. ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।

❖ কোন বিশেষ 'আমল দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়?

যে কোনো সৎ 'আমল দ্বার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এক মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

০১. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়;

০২. বেশি বেশি তাসবীহ্-তাহলীল এবং যিকির-আযকার করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়;

০৩. রাসূল ও সাহাবী জীবন-চরিত অধ্যয়ন করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়;

০৪. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্ত-গবেষণা করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়;

০৫. আখিরাতমুখী হক্বপন্থী আলেমগণের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে, প্রভৃতি।

❖ কোন কোন পাপের কারণে ক্ষণিকের জন্য ঈমান ছুটে যায়?

যে সকল পাপের কারণে ক্ষণিকের জন্য ঈমান ছুটে যায় এবং পাপকর্ম থেকে বিরত হওয়া পর পুনরায় ঈমান প্রত্যাবর্তন করে, তা নিম্নরূপ :

০১. যিনাকারী যখন যিনায় রত থাকে, তখন তার মাঝে ঈমান থাকে না এবং

০২. চোর যখন চুরিতে লিপ্ত থাকে তখনও তার মাঝে ঈমান থাকে না।

❖ ঈমান ভঙ্গের মৌলিক কারণ কয়টি ও কী কী?

ঈমান ভঙ্গের কারণ দশটি। যথা-

১. মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করা।

২. বান্দা ও মহান আল্লাহর মাঝে উসিলা নির্ধারণ করা।

৩. কাফিরদেরকে কাফির মনে না করা।

৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তরীকার চেয়ে অন্য কারো তরীকাকে অধিক পরিপূর্ণ মনে করা।

৫. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক আনীত বিধান কিংবা বিধানের অংশ বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

৬. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক আনীত ইসলামের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ করতে কাফিরের পক্ষে অবস্থান নেওয়া।

৯. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আনীত শরিয়তকে উপেক্ষা করে বিকল্প শরিয়ত গ্রহণ করা।

১০. মহান আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া।

❖ কিয়ামতের ছোটো আলামতসূহ কী কী?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিয়ামতের যে সকল ছোটো আলামতের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

১ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম, নবুওয়াত লাভ ও মৃত্যু;

২. মুসলিমদের হাতে বায়তুল মাকদিস বিজয় হবে;

৩. সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে;

৪. মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং যাকাত গ্রহণের লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না;

৫. নানারকম গোলযোগ ও ফিতনা বৃদ্ধি পাবে;

৬. নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে;

৭. হিজায থেকে বৃহৎ একটি আগুন বের হবে;

৮. মানুষের মাঝে আমানতদারিতা নষ্ট হয়ে যাবে।

৯. 'ইল্ম উঠিয়ে নেয়া হবে ও অজ্ঞতা বিস্তর লাভ করবে;

১০. ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে ও সর্বত্র সুদের লেনদেন ছড়িয়ে পড়বে;

১১. ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে এবং কৃপণতা বৃদ্ধি পাবে;

১২. বাদ্যযন্ত্র ও গায়ক-গায়িকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে;

১৩. মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষ এটাকে হালাল মনে করবে;

১৪. অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা ও বকরির রাখাল কর্তৃক সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করা;

১৫. কৃতদাসী কর্তৃক স্বীয় মনিবকে প্রসব করা;

১৬. মানুষ হত্যা ও হঠাৎ মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে;

১৭. অধিকহারে ভূমিকম্প হওয়া;

১৮. ভূমিধস ও চেহারা বিকৃতির শাস্তি দেখা দিবে;

১৯. কাপড় পরিহিতা সত্ত্বেও উলঙ্গ নারীদের বহিঃপ্রকাশ ঘটা;

২০. মু'মিনের স্বপ্ন সত্য হবে;

২১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও মিথ্যা বলা বৃদ্ধি পাবে;

২২. নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে;

২৩. আরব ভূখণ্ড তৃণভূমি ও নদ-নদীতে ভরে উঠবে;

২৪. ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় আবিস্কৃত হবে;

২৫. হিংস্র জীবজন্তু ও জড়ো পদার্থ মানুষের সাথে কথা বলবে;

২৬. রোমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং মুসলিমদের সাথে তাদের যুদ্ধ হওয়া এবং

২৭. কনস্টান্টিনোপল বিজয় হওয়া প্রভৃতি।

❖ কিয়ামতের বড়ো আলামতসমূহ কী কী?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিয়ামতের যে সকল বড়ো আলামতের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

১. ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব ঘটবে;

২. দাজ্জালের আগমন ঘটবে;

৩. ঈসা ইবনু মারইয়াম পুনরায় দুনিয়াতে আসবে;

৪. ইয়াযুয-ম'যুযের আগমন ঘটবে;

৫. পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে বড়ো ধরনের ভূমিধস হবে;

৬. আরব উপদ্বীপে একটি বড়ো ধরনের ভূমিধস হবে

৭. বিশাল একটি ধোয়া আসমান ও জমিনের খালি জায়গা গ্রাস করে ফেলবে;

৮. পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হবে;

৯. দাব্বাতুল আরদ নামক অদ্ভুদ এক জন্তু বের হবে;

১০. কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ইয়ামানের আদন নামক স্থানের গর্ত থেকে একটি ভয়াবহ আকারের আগুন বের হয়ে মানুষকে হাশ্রের দিকে একত্রিত করবে।

❖ 'ইবাদত কত প্রকার ও কী কী?

'ইবাদত সাধারণত দুই প্রকার। যথা-

০১. ফর্য 'ইবাদত; যা সম্পাদন করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অবশ্যক এবং ত্যাগ করলে কবীরাহ গুনাহ হবে।

০২. নফল 'ইবাদত। যা ঐচ্ছিক। সম্পাদন করলে সাওয়াব হবে, কিন্তু পরিত্যাগ করলে গুনাহ হবে না। তবে এমন কিছু নফল 'ইবাদত আছে, যা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। অতএব তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যেমন- বিতর সালাত।

❖ 'ইবাদত কবুল হওয়ার শর্তগুলো কী কী?

'ইবাদত কবুল হওয়ার শর্তগুলো নিম্নরূপ :

০১. একমাত্র মহান আল্লাহ'র জন্য শির্কমুক্ত 'ইবাদত করা;

০২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশিত পদ্ধতিতে বিদআতমুক্ত 'ইবাদত করা এবং

০৩. 'ইবাদতকারীর উপার্জন হালাল হওয়া।

❖ 'ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসানের সর্বোচ্চ স্তর কী?

'ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসানের সর্বোচ্চ স্তর হলো–

প্রথমতঃ বান্দা এমনভাবে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করবে, যেন সে আল্লাহ তা'আলাকে দেখছে অথবা

দ্বিতীয়তঃ মনের মধ্যে এমন অনুভূতি জাগ্রত করা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন।

❖ মৌলিকভাবে হক্ব কত প্রকার ও কী কী?

মৌলিকভাবে হক্ব দুই প্রকার। যথা-

০১. হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার হক্ব এবং

০২. হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক্ব।

❖ হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক্ব কয় প্রকার কী কী?

বান্দার হক্ব প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

০১. সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হক্বসমূহ এবং

০২. অন্যান্য সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত বান্দার পারস্পরিক হক্বসমূহ।

❖ বান্দার নিকট আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য হক্ব (হাক্কুল্লাহ) কী কী?

বান্দার নিকট আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য হক্ব হলো–

০১. বান্দার স্বীয় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত করবে;

০২. বান্দা কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করবে না;

০৩. আল্লাহর আদেশসমূহ যথাযথ প্রতিপালন করবে এবং

০৪. তাঁর নিষেধসমূহ সর্বৈব বর্জন করবে।

❖ মহান আল্লাহর নিকট বান্দার প্রাপ্য হক্ব (হাক্কুল ইবাদ) কী কী?

আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দার প্রাপ্য হক্ব হলো–

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন না।

❖ একজন মুসলিমের উপর আল কুরআনের কোন কোন হক্ব আদায় করা আবশ্যক?

মানব জীবনে পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ জন্য প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল কুরআনের নিম্নবর্ণিত হক্বসমূহ আদায় আবশ্যক। মুসলিমের উপর আল কুরআনের হক্বসমূহ–

০১. পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহের ঊর্ধ্বে, নির্ভুল এক কিতাব– এ 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস পোষণ করা;

০২. আল কুরআনের অনুশীলন ও সহীহ-শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করা;

০৩. নিয়মিত তিলাওয়াত ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা;

০৪. আল কুরআনের হিফয ও সংরক্ষণে সদা সচেষ্ট থাকা;

০৫. আল কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী 'আমল করা;

০৬. আল কুরআনে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা এবং

০৭. আল কুরআনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করা।

❖ উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কী কী রয়েছে?

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর উম্মাতে মুহাম্মদীর যে হক্ব বা অধিকার রয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

০১. নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কর্তৃক আনীত রিসালাতের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা;

০২. নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে রিসালাত পূর্ণতা লাভ করেছে এ বিশ্বাস পোষণ করা;

০৩. রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করা এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন পরিপূর্ণ বর্জন করা;

০৪. পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এমনকি নিজের জীবন থেকেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অধিক ভালোবাসা;

০৫. নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা;

০৬. নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সুন্নাত, আদত ও স্বভাব-চরিত্রের অনুসরণ করা;

০৭. নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রিসালাতের বার্তা সর্বসাধারণের মাঝে পৌঁছে দেওয়া এবং

০৮. নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা।

❖ সন্তানে নিকট পিতা-মাতার প্রাপ্য হক্ব কী কী

সন্তানের নিকট পিতা-মাতার প্রাপ্য মৌলিক হক্ব বা অধিকারসমূহ–

০১. আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতের পরে পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করা;

০২. কখনোই তাঁদের প্রতি বিরক্তিসূচক 'উহ্' শব্দটিও উচ্চারণ না করা;

০৩. তাঁদের সকল আদেশ যথযথ প্রতিপালন করা (যদি তা শরিয়ত বিরোধী না হয়)।

০৪. সামর্থ্যের মধ্যে তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া;

০৫. তাঁদের খোঁজ-খবর নেওয়া ও সেবাশুশ্রূষা করা;

০৬. তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধবান্ধবকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা প্রভৃতি;

০৭. পিতামাতার জন্য দু'আ করা;

০৮. শরিয়ত বিরোধী নয়, পিতামাতার এমন ওসীয়ত ও মান্নত পূরণ করা;

০৯. পিতা-মাতার পক্ষ থেকে দান-সাদাক্বাহ্ এবং হজ্জ-'উমরাহ্ পালন করা;

১০. মৃত্যুর পর তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ ও কবর জিয়ারত করা প্রভৃতি।

❖ পিতা-মাতার নিকট সন্তানের প্রাপ্য হক্ব কী কী?

পিতা-মাতার নিকট সন্তানের প্রাপ্য উল্লেখযোগ্য হক্ব বা অধিকারসমূহ–

০১. পৃথিবীতে আগমনের সাথে সাথে কর্ণকুহরে আযান দেওয়া;

০২. মাতৃস্নেহে দুই বছর দুগ্ধ পান করানো;

০৩. সপ্তম দিনে 'আক্বীক্বাহ্ করা, উত্তম নাম রাখা এবং মাথা মুণ্ডন করে চুলের ওজনে সাদাক্বাহ্ করা;

০৪. পুত্র সন্তানকে খাতনা করানো;

০৫. পিতৃস্নেহে সন্তানের ভরণ-পোষণ দায়িত্ব পালন করা;

০৬. পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেওয়া;

০৭. দীনের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া;

০৮. প্রথমত সালাত এবং পর্যায়ক্রমে ফর্‌য 'ইবাদতের আদেশ দেওয়া;

০৯. উপার্জনে সক্ষম করে গড়ে তোলা;

১০. সঠিক সময়ে বিবাহ দেওয়া এবং

১১. সন্তানের জন্য দু'আ করা।

❖ মুসলিমদের পারস্পরিক হক্ব কয়টি ও কী কী?

একজন মুসলিমের অপর মুসলিমের প্রতি ছয়টি হক্ব বা অধিকার রয়েছে। সেগুলো হলো–

০১. পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম করা;

০২. দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা;

০৩. কল্যাণ কামনা করলে তার কল্যাণ সাধন করা;
০৪. হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলা এবং জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা;
০৫. অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রূষা করা এবং
০৬. মৃত্যুবরণ করলে জানাযা ও দাফনে শরীক হওয়া।

❖ আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকারসমূহ কী কী?

ইসলাম আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সংরক্ষণে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। নিম্নে আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের উল্লেখযোগ্য প্রকার প্রদত্ত হলো–
০১. যে কোনো মূল্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা এবং ছিন্ন না করা;
০২. তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ও খোঁজ-খবর নেওয়া;
০৩. অভাবী আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করা;
০৪. সম্মানের সাথে আত্মীয়-স্বজনের মেহমানদারী করা;
০৫. বিভিন্ন উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনকে আমন্ত্রণ জানানো;
০৬. বিপদগ্রস্ত হলে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;
০৭. অসুস্থ হলে সেবাশুশ্রূষা করা;
০৮. দীনের ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া ও সতর্ক করা;
০৯. মৃত্যুবরণ করলে জানাযা ও দাফনে শরীক হওয়া প্রভৃতি।

❖ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আত্মীয় কতো প্রকার ও কী কী?

অগ্রাধিকরারের ভিত্তিতে আত্মীয় তিন প্রকার। প্রকারসমূহ ক্রমান্বয়ে প্রদত্ত হলো–
০১. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম প্রকার পিতৃ সম্পর্কিত আত্মীয়। যথা- দাদা-দাদী, চাচা ফুফু ইত্যাদি;
০২. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্বিতীয় প্রকার মাতৃ সম্পর্কিত আত্মীয়। যথা- নানা-নানী, মামা, খালা ইত্যাদি;
০৩. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তৃতীয় প্রকার বিবাহ সম্পর্কিত আত্মীয়। যথা- শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শালিকা।

❖ প্রতিবেশীর পারস্পরিক অধিকারসমূহ কী কী?

প্রতিবেশির অধিকার সংরক্ষণ করা ঈমানী দায়িত্ব। প্রতিবেশীদের পারস্পরিক উল্লেখযোগ্য অধিকারসমূহ প্রদত্ত হলো–
০১. প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা;
০২. প্রতিবেশী কষ্ট পায় এমন আচরণ ও কাজ থেকে বিরত থাকা;
০৩. অভুক্ত প্রতিবেশীর গৃহে সাধ্যমত খাদ্য পৌঁছানো;
০৪. প্রতিবেশীর দাওয়াত বা নিমন্ত্রণ কবুল করা;
০৫. প্রতিবেশীর জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাযত করা;
০৬. প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা;
০৭. প্রতিবেশির প্রয়োজন পূরণে সাধ্যমত সহযোগিতা ও কর্মে হাসানা প্রদান করা;
০৮. প্রতিবেশির শোক-দুঃখে পাশে থাকা ও সান্ত্বনা দেওয়া;
০৯. দীনের ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া ও সতর্ক করা;
১০. প্রতিবেশির জানাযা ও দাফনে শরীক হওয়া;
১১. প্রতিবেশীর মৃত্যুতে ন্যূনতম তিনদিন তাদের গৃহে খাদ্য পৌঁছানো প্রভৃতি।

❖ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিবেশী কতো প্রকার ও কী কী?

অগ্রাধিকরারের ভিত্তিতে প্রতিবেশী তিন প্রকার। প্রকারসমূহ ক্রমান্বয়ে প্রদত্ত হলো–
০১. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম প্রকার আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী;
০২. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্বিতীয় প্রকার মুসলিম প্রতিবেশী এবং
০৩. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তৃতীয় প্রকার হলো অমুসলিম প্রতিবেশী।

❖ একজন ঈমানদারের কাছে রাস্তার কী কী হক্ব রয়েছে?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় উম্মতকে রাস্তার উপর বসতে নিষেধ করেছে এবং বলেছেন, একান্ত যদি বসতেই হয় রাস্তার হক্বসমূহ আদায় করবে। রাস্তার হক্বসমূহ নিম্নরূপ :
০১. দৃষ্টি সংযত (নিম্নগামী) রাখা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া;
০২. সালামের প্রতি-উত্তর বা জবাব দেওয়া এবং
০৩. সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা। এছাড়াও
০৪. পথহারা পথিককে পথ দেখাতে সাহায্য করা।
০৫. পথিকের বোঝা বহনে তাকে সহযোগিতা করা;
০৬. অসহায় ও বিপদগ্রস্ত পথিককে পথ চলতে সাহায্য করা এবং
০৭. অহংকার ও দম্ভভরে চলাচল না করা।

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ঢাকা জেলার

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

ডিসেম্বর

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:৫৯	০৬:২৩	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
০২	০৫:০০	০৬:২৪	১১:৪৯	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
০৩	০৫:০০	০৬:২৪	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৪২
০৪	০৫:০১	০৬:২৫	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৪২
০৫	০৫:০২	০৬:২৬	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৪২
০৬	০৫:০২	০৬:২৭	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৪২
০৭	০৫:০৩	০৬:২৭	১১:৫১	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৪২
০৮	০৫:০৩	০৬:২৮	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৪৩
০৯	০৫:০৪	০৬:২৮	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৪৩
১০	০৫:০৫	০৬:২৯	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৪৩
১১	০৫:০৫	০৬:৩০	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৪৩
১২	০৫:০৬	০৬:৩০	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৩	০৫:০৬	০৬:৩১	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৪	০৫:০৭	০৬:৩২	১১:৫৪	০২:৫৩	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৫	০৫:০৮	০৬:৩২	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৫	০৬:৪৫
১৬	০৫:০৮	০৬:৩৩	১১:৫৫	০২:৫৪	০৫:১৫	০৬:৪৫
১৭	০৫:০৯	০৬:৩৩	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৬	০৬:৪৬
১৮	০৫:০৯	০৬:৩৪	১১:৫৬	০২:৫৫	০৫:১৬	০৬:৪৬
১৯	০৫:১০	০৬:৩৪	১১:৫৬	০২:৫৫	০৫:১৬	০৬:৪৬
২০	০৫:১০	০৬:৩৫	১১:৫৭	০২:৫৬	০৫:১৭	০৬:৪৭
২১	০৫:১১	০৬:৩৬	১১:৫৭	০২:৫৬	০৫:১৭	০৬:৪৭
২২	০৫:১১	০৬:৩৬	১১:৫৮	০২:৫৭	০৫:১৮	০৬:৪৮
২৩	০৫:১২	০৬:৩৭	১১:৫৮	০২:৫৭	০৫:১৮	০৬:৪৮
২৪	০৫:১২	০৬:৩৭	১১:৫৯	০২:৫৮	০৫:১৯	০৬:৪৯
২৫	০৫:১৩	০৬:৩৭	১১:৫৯	০২:৫৮	০৫:২০	০৬:৫০
২৬	০৫:১৩	০৬:৩৮	১২:০০	০২:৫৯	০৫:২০	০৬:৫০
২৭	০৫:১৪	০৬:৩৮	১২:০০	০২:৫৯	০৫:২১	০৬:৫১
২৮	০৫:১৪	০৬:৩৯	১২:০১	০৩:০০	০৫:২১	০৬:৫১
২৯	০৫:১৪	০৬:৩৯	১২:০১	০৩:০১	০৫:২২	০৬:৫২
৩০	০৫:১৫	০৬:৩৯	১২:০২	০৩:০১	০৫:২২	০৬:৫২
৩১	০৫:১৫	০৬:৪০	১২:০২	০৩:০২	০৫:২৩	০৬:৫৩